বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬৯



প্রকাশ করেছেন :
রঞ্জন
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৯ এ্যান্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
আশিস চৌধুরী
ছেপেছেন :
বি. বি. রায়
রায় প্রিন্টার্স
৯ এ্যান্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৯
মূল্য ছয় টাকা

ডক্টর মহম্মদ এনামুল হক

সুহৃদবরেষু

প্রাসঙ্গিক

এখানে সংকলিত রচনাগুলির পরিচয় বইয়ের নামেই নিহিত। প্রায় অধিকাংশ রচনাই হালে রচিত এবং হালের সমস্যার সঙ্গে এসবের সম্পর্কও নিঃসন্দিগ্ধ। বিষয়বস্তুতে মিল আর লেখকের বক্তব্যে ঐক্য রয়েছে বলে কোন কোন রচনায় পুনরাবৃত্তি-দোষ যে ঘটে নি তা নয়। অনিবার্য কারণে তা এড়ানো সম্ভব হয় নি।

লেখকও কালের সন্তান আর কাল-শাসিত বলে কালের ঘটনা-স্রোতের প্রতি উদাসীন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় ঐ সব ব্যাপারে বক্তব্যহীন হওয়া বা থাকাও। সব লেখকেরই দেশ, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু না কিছু বক্তব্য থাকে। আমার নিজেরও আছে। এ লেখাগুলিতে তার নিঃসন্দেহ প্রতিফলন সহজেই লক্ষ্যগোচর। আমি আমার এ সব বক্তব্য অত্যন্ত সবিনয়ে পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি স্রেফ তাঁদের সুবিবেচনার প্রত্যাশায়। এ ছাড়া অন্য কোন কাম্য নেই আমার।
আমার বক্তব্যের সঙ্গে অন্যদের মতামতের মিল থাকতেও পারে (না থাকাও বিচিত্র নয়) কিন্তু তাই বলে আমি কারো বা কোন প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র কিংবা প্রতিনিধি নই। আমি আমার নিজেরই মুখপাত্র। কাজেই এখানে প্রকাশিত মতামতের দায়-দায়িত্ব সব আমার নিজের।

'ছাত্র রাজনীতির ভয়াবহ পরিণতি' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তার চেয়ে এখন অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। সততার সঙ্গে পরীক্ষা তদারক করতে গিয়ে কয়েকজন অধ্যাপক এবার মারাত্মকভাবে প্রহৃত হয়েছেন, প্রহৃত হয়েছেন ছাত্রদের হাতে। কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে মোতায়েন করতে হয়েছে পুলিস, কোথাও কোথাও জারি করতে হয়েছে ১৪৪ ধারা। এ থেকে 'ভয়াবহ পরিণতি'টা যে কতখানি 'ভয়াবহ' হয়ে উঠেছে তা সহজেই অনুমেয়।
১৯৬৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্কুল' শিক্ষকদের প্রাদেশিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে আমি ভাষণ দিয়েছিলাম 'শিক্ষকদের প্রতি ভাষণ', নামে তা এ সর্বপ্রথম আমার প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হলো।

এটায় এবং আরো একাধিক প্রবন্ধে শিক্ষা-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আর দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান মিলবে।

লেখাগুলির সাময়িকতা যাতে হারিয়ে না যায় এ কারণে ছাপার কাজ দ্রুত সারতে হয়েছে। ফলে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানো যায় নি। এ জন্য লেখক আর প্রকাশকের দুঃখ জানানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। বইটির ছাপা ও প্রকাশনা সম্পর্কে আমি স্নেহভাজন মুহম্মদ খায়ের উল বসরের কাছ থেকে অযাচিত সাহায্য পেয়েছি। মুদ্রণ ব্যাপারে 'অরোরা' প্রেসের মালিকের সযত্ন সহায়তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

তাঁর পক্ষে খুব উপযুক্ত না হলেও বইটির সঙ্গে বহু গুণান্বিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের নাম সংযুক্ত করতে পেরে আমি আশাতিরিক্ত আনন্দ বোধ করছি।

আবুল ফজল

নিবেদন

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজলের এই গ্রন্থ ১৯৭০ সনের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটি তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন বর্তমানে সশস্ত্র স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান যুদ্ধের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির জন্য আন্দোলনের গোড়ার সমস্যা ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। সেদিক থেকে এ গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীবাহিনীর নির্মম বীভৎসতায় জনাব আবুল ফজল বর্তমানে মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় কোন রকমে বেঁচে আছেন। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র জনাব আবুল মঞ্জুর আমাদের এই গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

—প্রকাশক

সূচীপত্র

এ লেখকের আরো কয়েকটি বই

রাঙ্গা প্রভাত

জীবন পথের যাত্রী

আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠ গল্প

কায়েদে আজম

রেখাচিত্র

সাহিত্য : সংস্কৃতি ও জীবন

স্বয়ম্বরা

সমাজ : সাহিত্য : রাষ্ট্র

লেখকের রোজনামচা

সাংবাদিক মুজীবর রহমান

কায়কোবাদ : কাব্য সংকলন

ছদ্মবেশী

সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তা

আমরা যারা বহুনিন্দিত পরাধীনতার যুগে লেখার কিছুটা বদ্-অভ্যাস করে বসেছিলাম, তাদেরই হয়েছে সব চেয়ে কাহিল অবস্থা এখন। সে পুরোনো বদ্-অভ্যাসটা আজো আমরা ছাড়তে পারি নি বলে দেশ-দুনিয়া, রাষ্ট্র-সংস্কৃতি ইত্যাদি যা কিছু মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত সে সম্বন্ধে লিখতে চাই। লেখার জন্য আমাদের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে—যা এ যুগের লেখক মাত্রেরই এক বিবেকী দায়িত্ব বলে আমার বিশ্বাস। সে দায়িত্ব আমরা এখন আংশিক ভাবেও পালন করতে পারছি না এ আমাদের এক বড় দুঃখ। অধিকন্তু আমরা এ দায়িত্ব পালনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকলেও প্রেস আর পত্রিকা সে ঝুঁকি নিতে মোটেও রাজী নয়। ঝুঁকি নেওয়া তাঁদের পক্ষে হয়তো সম্ভব হচ্ছে না, দেশের কোন কোন প্রেস আর পত্রিকার ভাগ্য দেখে তাঁরা যদি আতঙ্কিত হয়ে থাকেন তার জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু লেখা তথা সাহিত্য-শিল্পের জন্য প্রকাশের মাধ্যম প্রাথমিক শর্ত। প্রকাশ ছাড়া সাহিত্য আর সাহিত্যিক জন্মাতে পারে না, পারে না বাঁচতে, বিকাশ তো দূরের কথা। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার এখন যে-জীবন্মৃত অবস্থা তার জন্য চারদিকের এ পরিবেশই অনেকখানি দায়ী। সমাজের দিকে তাকালে এখন কি দেখতে পাই আমরা? দেখতে পাই একদিকে চরম স্বার্থপরতা, অর্থগৃধ্নুতা অন্যদিকে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক। কি রকম লেখা লিখলে বা কি কথা বললে সরকারের বিরাগভাজন হবো না আর পত্রিকা সম্পাদকরাও ছাপতে সাহস পাবেন—এ হিসেব করে আর এ কথা স্মরণে রেখে ভেবে ভেবে লিখতে গেলে ছাপার উপযোগী লেখা এক রকম দাঁড় করানো যায় বটে, কিন্তু তা সাহিত্য হয় না। সাহিত্য মুক্ত আবহাওয়া আর স্বাধীন পরিবেশের ফসল। সাহিত্য আর শিল্পের এ এক মৌল দাবী।

এখন যে-শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় আমরা বাস করছি তা রাষ্ট্রের জন্যও কিছুমাত্র লাভজনক ও কল্যাণকর নয়। অ্যামিয়েল তাঁর জর্নালে মন্তব্য করেছেন: A state

founded upon interest alone and cemented by fear is an ignoble and unsafe construction (p 178). অর্থাৎ স্বার্থ আর আতঙ্কের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসৌধের ভিত অত্যন্ত নড়বড়ে হয়ে থাকে। সমাজের সর্বস্তরে উচু থেকে নীচু পর্যন্ত স্বার্থপরতা কি ভাবে তার অটুট জাল বিস্তার করেছে তা বোধ করি বলার প্রয়োজন রাখে না। যাঁরা এখন যে-কোন রকমে ক্ষমতায় বসে আছেন, আগে তাঁদের আর তাঁদের আত্মীয়দের কতটুকু সম্পত্তি ছিল আর এখন তা কতখানি হয়েছে তার একটা খতিয়ান পাওয়া গেলে এ স্বার্থপরতার কিছুটা স্বরূপ হয়তো জানা যেতো। কিন্তু তা জানার উপায় নেই।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে 'বুদ্ধির মুক্তি' নামে একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল আর তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় আর আশে-পাশের স্কুল-কলেজের শিক্ষক আর অধ্যাপকবৃন্দ। আজ কি তেমন কথা ভাবা যায়? নবতর চিন্তার ক্ষেত্রে, যে-চিন্তার সঙ্গে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র আর সংস্কৃতিচর্চার সম্পর্ক রয়েছে, তাতে অংশগ্রহণ কিংবা নেতৃত্বদানের কথা বললে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও আঁৎকে উঠেন, ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখেন একবার। তাঁরা জানেন দেওয়ালের শুধু নয়, হাওয়ারও কান গজিয়েছে এখন, অথচ স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ছাড়া কোন সমাজ, কোন রাষ্ট্র এবং কোন সভ্যতাই সামনের দিকে এগুতে পারে না। গ্রীক, রোমান ও আরব সভ্যতার যুগে যাদের 'স্বাধীন নাগরিক' বলা হতো, এ অবস্থা দীর্ঘকাল চললে, তেমন 'স্বাধীন নাগরিক' এ দেশে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। গ্রীক কবি ইউরিপিডিস্ গোলাম বা দাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: 'A slave is he who cannot speak his thought.' আমার আশঙ্কা—দোতলা, চৌতলা কিংবা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত বাড়ি, গাড়ি বা টেলিভিশন ইত্যাদি যাবতীয় আধুনিক সম্পদের মালিক হয়েও দিন দিন মনের দিক দিয়ে আমরাও হয়তো একটা দাস-জাতিতে পরিণত হতে চলেছি। বলা বাহুল্য স্বাধীন মনই সব সভ্যতার বাহন আর সব সভ্যতার নির্মাতা। সে স্বাধীন মনের অধিকার হারালে মনুষ্যত্ব বলতে আমাদের আর কিছুই থাকবে না—তখন সভ্যতার মানে দাঁড়াবে খোশামোদ তোষামোদে দক্ষতা আর ইজ্জত-সম্মানের মাপকাঠি হবে তোরণ, ইলেকট্রিক বাল্‌ব্ আর ডিনার পার্টির সংখ্যা। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলছি আমরা প্রায় এ অবস্থায় পৌঁছে গেছি সব রকম সুরুচি,

মূল্যবোধ আর নৈতিক চেতনা যা সভ্যতার বুনিয়াদি উপকরণ তা আজ দেশ-ছাড়া! অ্যামিয়েল অন্যত্র বলেছেন : 'Society rests upon conscience not upon science. Civilization is first and formost a moral thing' (p. 177).

বিবেকের চর্চা ও অনুশীলন কি সমাজে কোথাও আছে এখন? . তার কোন মূল্য কি সমাজ ও রাষ্ট্র দিয়ে থাকে? সমাজে বিবেকী মানুষের আজ আর কোন স্থান নেই, সরকার তেমন মানুষকে মনে করে শত্রু, শুধু নিজের নয়, মনে করে দেশেরও। সরকার চায় Yes-man বা হাঁ-হুজুর অথবা ভয়ে কাবু হয়ে থাকা নির্বীর্য মানুষ। বিবেকের সাথে আইনের শাসন চালাতে গিয়ে কোন কোন সুদক্ষ বিচারপতিকে-যে সরকারের বিরাগভাজন হতে হয়েছে সে খবর দেশের কারো অজানা নয়।

গ্রীসকে বলা হয় আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগৃহ—সে গ্রীসের অধিবাসীদের সম্বন্ধে হেরোডোটাসের মন্তব্য হচ্ছে : 'They obey only the law.' শুধু গ্রীসের নয় সব সভ্যতারই বুনিয়াদ আইন আর আইনের শাসন—আইনের প্রতি শাসক আর শাসিতের সার্বিক ও বিনা শর্তে আনুগত্য। এ-সম্বন্ধে অন্য একটা প্রবন্ধে আমি কিছুটা আলোচনা করেছি—এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। শুনেছি মুসলিম শাসনের আমলে বাদশাহের পার্শ্বেই থাকতো কাজীউল কুজ্জাতের আসন। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রকেও বলা হয় ইসলামী বা মুসলিম রাষ্ট্র অথচ মুসলিম রাষ্ট্রের এ সব সুস্থ ঐতিহ্য এখানে অনুসৃত হয় না। আইন-যে আজ আমাদের দেশে কতখানি বিপর্যয়ের সম্মুখীন তার বহু দৃষ্টান্তই আমি উল্লেখ করতে পারতাম। কিন্তু উপরে যে-আতঙ্কের কথা বলেছি, অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি আমিও সে আতঙ্ক-মুক্ত হতে পারি নি। লেখকের স্বাধীনতা-যে আজ কতখানি সংকুচিত হয়ে পড়েছে এ থেকে তা অনুমেয়। আমরা লেখকরাও আজ মনের দিক দিয়ে বন্দী। সেদিন ঢাকার মনস্তত্ত্ব সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছেন : দেশের তরুণরা এখন এমন সিনিক হয়ে পড়েছে কেন? সমাজের সার্বিক চেহারার দিকে তাকালে তিনি সহজেই তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, শিক্ষায়তন আর বিচারালয়গুলিতে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে মূল্যবোধের যে-চরম অবনতি ও অবক্ষয় তরুণরা, বিশেষ করে সচেতন ছাত্রসমাজ প্রতিনিয়ত দেখছে তাতে সিনিক না হয়ে উপায়

কি? এসব কি ওদের তরুণ মনকে প্রভাবিত করছে না? যখন সমাজে কোথাও সততা, আন্তরিকতা ও মহৎ মনুষ্যত্বের ক্ষীণ রশ্মিরেখাও দেখা যাচ্ছে না তখন তরুণ সমাজ কি দেখে প্রেরণা পাবে ও উৎসাহবোধ করবে?' কি করে হয়ে উঠবে তারা আশাবাদী? আমাদের জাতীয় জীবনে এ এক চরম দুর্দিন। স্বাধীনতার আগে বা পরে মননশীলতা আর সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এমন দুর্দিন আমি আর কখনও দেখি নি।

কোন দেশের কোন সংস্কৃতিই স্বয়ম্ভু নয় বা আসমান থেকেও ঝুপ করে ঝরে পড়ে না। মাটিই তার জন্মভূমি। সংস্কৃতিও ভূগোলের রেখায় হয়ে ওঠে রেখায়িত। ক্রমাগত অনুশীলন আর চর্চার দ্বারাই ঘটে তার বিকাশ। তার জন্য অনুকূল ক্ষেত্র আর পরিবেশ অত্যাবশ্যক। সে ক্ষেত্র দেশে কি ভাবে সংকুচিত হয়ে এসেছে আর প্রতিনিয়ত তার উপর কিভাবে হামলা চলছে তার তিক্ত অভিজ্ঞতা এদেশের সব সংস্কৃতিসেবী আর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। আগে সমাজে অধিকারী-ভেদ কথাটার স্বীকৃতি ছিল—যার যে-বিষয়ে অধিকার নেই সে সে-বিষয়ে কথা বলতে, মতামত দিতে লজ্জা ও সংকোচ বোধ করতো। এখন ক্ষমতা মানে সবজান্তামি আর অনধিকারচর্চাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, শিল্প ইত্যাদি নিয়ে যাঁরা সারাজীবন কিছুমাত্র মাথা ঘামান নি ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথে তাঁরা হয়ে ওঠেন ঐ সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আর শুরু করেন ফতোয়া দিতে। আবার 'বাবু যত বলে পারিষদ-দল বলে তার শতগুণ'। সরকারী এ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন আজ এক বিরাট সংকটের সম্মুখীন। আগেই ইঙ্গিত করেছি Academic freedom তথা জ্ঞানগত অনুশীলনের স্বাধীনতা বলতে যা বুঝায় তা আজ এদেশের শিক্ষায়তনগুলিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও এখন স্বাধীন চিন্তার চর্চা করেন না। করলেও তা প্রকাশ করার সাহস পান না। এ অবস্থায় দেশে চিন্তাবিদ ও সত্যিকার সংস্কৃতিসেবীর আবির্ভাব কল্পনা করা যায় না। সব রকম উচ্চতর জ্ঞানের উৎস-কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, চিন্তা আর জ্ঞানচর্চার দিক দিয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয় আজ স্রেফ এক বন্ধ্যা ঊষার মরুভূমিতে পরিণত। এমন মরুভূমিতে আশাবাদ অঙ্কুরিত হয় না।

সাহিত্যিক-শিল্পীরা স্বভাবতই আশাবাদী—সব রকম প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা নিজের মনের আশাটাকে জিইয়ে রাখতে চায়। কারণ আশা তাদের শিল্পী-

সত্তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু এ রকম সার্বিক অবক্ষয়ের মাঝে তারা আর কতদিন আশার এ ক্ষীণ দীপশিখাকে অনির্বাণ রাখতে সক্ষম হবে? মনে হয় প্রতিকারের সব পথই যেন আজ বন্ধ। এ সার্বিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লেখকরা সংগ্রাম করবেন কি করে? এ অবক্ষয়ের প্রতিভূ যে-ক্ষমতা তা আজ এত অন্ধ, এত হৃদয়হীন ও নির্মম রূপ নিয়েছে যে, তা মানুষের জীবিকা কেড়ে নিতেও দ্বিধা করে না—এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রায় আত্মহত্যার সামিল হয়ে উঠেছে! সরকার বা অন্য যে-ই হোক তার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম চালাতে হলেও বিপক্ষেরও কিছুটা অন্তত মানবিক গুণ, শুভবুদ্ধি ও সহনশীলতা থাকা প্রয়োজন, মত্ত হাতী বা পাগলা ষাঁড়ের সামনে আপনি বুক পেতে দাঁড়াবেন কি করে? আজ যে-কোন প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধতা ক্ষমতার কাছে যেন ষাঁড়ের সামনে লাল শালু! শিক্ষা-সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রদেশের কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্যে যে-দুর্ভোগ ও অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে তা কারও আগোচর নয়। আমি নিজে শিক্ষক ছিলাম—ছাত্র-ছাত্রীদের এ দুঃখ ও অসহায়তা আমাকে বারে বারে বেদনার্ত করে তোলে। চোখের সামনে প্রতি-কারের কোন উপায় দেখতে পাই না বলে বেদনাটা আরো মর্মান্তিক হয়ে বাজে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত আত্মজীবনীতে লিখেছেন: But it depends upon the existence of certain virtues in those against whom it is employed. প্রতিবাদ যে-শক্তির বিরুদ্ধে করা হয় তারও কিছুটা অশুভ-সহনশীলতা ও মানবিক গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। দুঃখের বিষয় আমাদের বর্তমান কর্তৃপক্ষ এ virtue বা মানবিক গুণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ফলে নিরাপদে কোন আলোচনা-সমালোচনা কিংবা প্রতিবাদ কি আন্দোলন কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না এখন দেশে। অথচ এ সবই সভ্যতা আর গণতান্ত্রিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিত পৃথিবীতে কোন দিন কোন yes-man কিছু গড়ে তোলে নি, করে নি কিছুই সৃষ্টি। হাঁ-হুজুর কখনো সৃজন-শীল হতে পারে না। তেমন নজির ইতিহাসে কোথাও নেই। সাহিত্য, শিল্প, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্যকলা ইত্যাদি সব কিছুই স্বাধীন মন ও স্বাধীন শিল্পী-প্রতি-প্রতিভারই অবদান। কিন্তু তার জন্য মুক্ত হাওয়া আর স্বাধীন পরিবেশ অত্যাবশ্যক। মনের যে-স্বাধীনতার কথা বলছি তার জন্য আত্মপরীক্ষা অপরিহার্য —আত্মপরীক্ষা শুধু স্বাধীনতাকে নয় মনুষ্যত্বকেও সার্থক করে তোলে। সব রকম

শিল্পসাধনাকেও করে তোলে বিচিত্রমুখী। পশুর আত্মপরীক্ষা নেই, কিন্তু মানুষ মানুষ হয় এ আত্মপরীক্ষার পথেই। সক্রেটিস তাঁর Apologyতে বলেছেন, 'The unexamined life is not worth living' অর্থাৎ অপরীক্ষিত জীবন টিকে থাকারও অনুপযুক্ত। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার মূলেও রয়েছে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনা। আমাদের সমাজ আর সরকার দুই-ই আত্মসমালোচনাকে শুধু-যে ভয়ের চোখে দেখে তা নয় বরং তার সম্বন্ধে অত্যন্ত অসহিষ্ণুও। ধর্ম-দর্শন সাহিত্য ও শিল্প-কলা সব কিছুই এ আত্ম-পরীক্ষারই পরিণতি। এ কারণেই তা বিভিন্ন ও স্বাতন্ত্র্য-অভিসারী। ধর্ম বা সংস্কারের উপর রোলার চালাতে গেলে মননশীলতা আর সংস্কৃতিচর্চা একটা অচলায়তনের নিগড়ে আটকা না পড়ে পারে না। সংস্কৃতির রূপ কখনো একবর্ণ হয় না—জীবন্ত সংস্কৃতি সব সময় বিচিত্র ও বহুবর্ণ। এমনকি তার মধ্যে স্ববিরোধিতার স্থানও রয়েছে। মৃত্যুর বর্ণ এক, জীবন বহুবর্ণ। যে-সংস্কৃতি বহুবর্ণ হতে অনিচ্ছুক তার অকালমৃত্যু অনিবার্য। যে-সংস্কৃতি বিশ্বের ভাবং মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দিতে, গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে অপারগ সে সংস্কৃতি অচিরে রুগ্‌ণ, রক্তহীন ও ফ্যাকাসে-যে হয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। গোঁড়ামি সব সময় আত্মবিনাশী—সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা আরো বেশী মারাত্মক। সংস্কৃতির ধর্মই হলো গ্রহণ—বর্জন নয়। তাই সরকারী অনধিকারী মুখপাত্ররা যখন বর্জনের ধুয়া তোলেন তখন সত্যিকার সংস্কৃতিসেবীরা আতঙ্কিত না হয়ে পারেন না। সংস্কৃতির প্রধান বাহন ভাষা—যে-ভাষায় আপনি সংস্কৃতি সাধনা করবেন সে ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি-সাধনা মানে ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয় করা। ধর্ম আর সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার—এ সত্যটা উপলব্ধি না করে অনেকে তাল-গোল পাকিয়ে বসেন। আরো দুঃখের বিষয় যাঁরা সংস্কৃতিচর্চাকে সবসময় ধর্মের আলখাল্লা পরাতে চান তাঁরা নিজেরা ধার্মিক যেমন নন তেমন নন সংস্কৃতিসেবীও। ধর্মের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন আর স্রষ্টার সঙ্গে বোঝাপড়াই তার একমাত্র লক্ষ্য—সাহিত্য-শিল্পও-যে সময় সময় এ কর্তব্য পালন করে না তা নয়, কিন্তু তার দিগন্তরেখা আরো প্রসারিত, আরো বহুবিস্তৃত জীবনের সব রকম অভিব্যক্তিই তার এলাকা-ভুক্ত—চরম পাপীও তার প্রিয় বিষয়বস্তু! যে-দিন মানুষের মন স্রষ্টার ধ্যান-ধারণা তথা পরলোকমুখীনতা ত্যাগ করে মানুষের জাগতিক জীবন আর তার বিচিত্র রহস্যময় অভিব্যক্তির দিকে ফিরে তাকিয়েছে

সত্যিকার অর্থে সেদিন থেকেই শিল্পসাহিত্যের জন্ম—সেদিন থেকেই তার দিগ্‌-বিজয়, সেদিন থেকেই তার জয়যাত্রা। রহস্য, অলৌকিকতা আর অপৌরুষেয় কর্তৃত্বের বন্ধন থেকে মানুষের মন যেদিন মুক্তি পেয়েছে সেদিন থেকে সাহিত্য-শিল্পেরও ঘটেছে বন্ধন-মুক্তি। এদিন থেকেই হয়েছে মানুষ সৃজনশীল। স্রষ্টার মতোই স্রষ্টাপ্রেরিত ধর্মও অচল, স্থির ও অপরিবর্তনীয়—তাতে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান ও মতভেদের কোন স্থান নেই। অথচ ওটা ছাড়া সাহিত্য সাহিত্যই হতে পারে না। ব্যাপক অর্থে মানব মনের জিজ্ঞাসা আর তার উত্তর সন্ধানই সাহিত্য আর শিল্প। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নাটক, নৃত্য এ সবই মানুষের তৈরী, মানুষের আত্মজিজ্ঞাসারই ফল, মানব-মনীষারই অবদান। মানবজীবনের মতো এ সবেরও পরিবর্তন পরিবর্ধন আছে, আছে রূপান্তর। যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের প্রয়োজন, চাহিদা, এষণা ও অভীপ্সা অনুসারে এগুলি নব নব ভাবে রূপায়িত হয়েছে, ও হচ্ছে। আঙ্গিকে যেমন তেমন ভাবে আর বিষয়বস্তুতেও নবায়িত হয়ে ওঠার উপরই নির্ভর করে এ সবের আয়ু আর অস্তিত্ব। আমাদের ধর্মহীন ধর্মধ্বজীদের নিষেধ মানতে গেলে দেশে সব রকম সংস্কৃতি-সাধনার ভরাডুবি অনিবার্য। জিজ্ঞাসা বন্ধ হওয়া মানে উত্তর না খোঁজা, সমস্যার মোকাবিলা করতে অস্বীকার করা মানে সমাধানের দিকে পিঠ ফিরে থাকা। এ ভাবে উটপাখি সাজা বকধার্মিক কাজ হতে পারে কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম এ নয়। সাহিত্যের ধর্ম স্বর্গ মর্ত্য তন্ন তন্ন করা, সব বন্ধ দরজা খুলে দেওয়া। সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ট্র্যাজেডি—যা মানুষের সর্ব সত্তাকে নাড়া দেয়। সে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি-সম্বন্ধে হার্বার্ট জে. মুলার তাঁর ***Freedom in the Ancient World*** গ্রন্থে লিখেছেন :...great tragedy can be written only by men who are free in mind and spirit, no longer slaves to "miracle, mystery and authority" (p. 172).

এ বক্তব্যের আলোয় আমরা ধর্মস্থান আর ধর্মপ্রধান বা ধর্মপ্রাণ দেশগুলির দিকে তাকালে বুঝতে পারবো কেন সেখানে শুধু মহৎ ট্র্যাজেডি নয়, এমনকি কোন ভালো নাটক, নভেল বা উচ্চাঙ্গের সংগীত কিংবা নৃত্যকলারও সৃষ্টি হয় নি। আমাদের দেশেও এমনকি উচ্চাঙ্গের ইসলামী সংগীত যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরাও প্রচলিত অর্থে উচ্চাঙ্গের ধার্মিক ছিলেন না।

ধর্ম অপ্রয়োজনীয় বা মানবজীবনে তার কোন মূল্য নেই তেমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য ধর্মকে ধর্মের এলাকায় সীমিত রাখাই সঙ্গত—আর সাহিত্য-শিল্প তথা সাংস্কৃতিক সাধনাকে দেওয়া উচিত মানবজীবনের বিচিত্র রহস্য সন্ধানের পুরোপুরি সুযোগ ও স্বাধীনতা। যাঁরা ধর্মকে মানুষের জীবনের একমাত্র অবলম্বন বা সারাক্ষণের বস্তু মনে করেন আমার বিশ্বাস মানবজীবন তথা মানবচরিত্র-সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণাই নেই। যে-মানুষ উদয়াস্ত সারাদিন তসবিহ্ জপেই কাটিয়ে দেন তিনি কি কখনো পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারবেন? এমন মানুষের দ্বারা দেশের সমাজের ও রাষ্ট্রের কি কিছুমাত্র ফায়দা হবে? চারদিকে পৃথিবীব্যাপী আমরা সভ্যতার যে-বিচিত্র উপকরণ দেখছি তার কোন কিছুই এসব ধার্মিকের অবদান নয়। বরং এর অনেক কিছুর সঙ্গে ধর্মের বিরোধ রয়েছে। সিনেমা টেলিভিশনকে ধর্ম-সম্মত প্রমাণ করতে হলে ধর্মের কাঁটাটাকে ইচ্ছামতো মোচড়াতে হবে! আমার বিশ্বাস জীবনের আনন্দবেদনাকে উপেক্ষা করে কোন ধর্মপ্রবর্তকও এভাবে জীবন কাটান নি বা কাটাবার নির্দেশ দেন নি। আমাদের দেশে যাঁরা ধর্মের কথা বলেন, তাঁরা আনুষ্ঠানিক ধর্মের বাইরে মানব-জীবন, মানবচরিত্র ও মানবস্বভাবের কোন খোঁজই রাখেন না। তাই এ সবের বিকাশ কি করে ঘটে সে খবরও তাঁদের অজানা। এঁরা ধর্মকে ধর্মের জন্য ব্যবহার করেন না, তদুপরি ধর্মকে এঁরা ব্যবহার করেন জাগতিক স্বার্থ লক্ষ্য করেই। এঁদের উপেক্ষা করে চলা ছাড়া শিল্পী আর সংস্কৃতিসেবীদের অন্য কোন উপায় নেই। বিবাদে লিপ্ত হওয়া মানে অযথা নিজের শক্তি ক্ষয় করা। বলা বাহুল্য, মহৎ শিল্পীমাত্রই বিদ্রোহী। শিল্পীর এ বিদ্রোহী সত্তার সম্বন্ধেও আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হবে। যুগে যুগে বিদ্রোহের পথেই শিল্পের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমাদেরও এ পথ, ঐতিহ্যের নামে সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে থাকলে আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না সংস্কৃতিচর্চার পথে এক পা-ও এগিয়ে যাওয়া। ফলে আমাদের দেশ, আমাদের যুগ বন্ধ্যা হয়েই থাকবে—ভবিষ্যতের হাতে আমরা কিছুই তুলে দিতে পারবো না। শুধু গ্রহীতা হয়েই থাকবো, দাতার ভূমিকা আমাদের ভাগ্যে কখনো জুটবে না। কোন দেশ, বা জাতির পক্ষে এ ভূমিকা কিছুমাত্র গৌরবের নয়। সাহিত্য আর বিভিন্ন শিল্পকলা আমাদের সামনে যে-সৌন্দর্যের পসরা খুলে দেয় তাতে মন আমাদের উন্নত হয়, রুচি হয় মার্জিত, পাই আমরা এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্বাদ। তা ছাড়া আরো

একটি বিশেষ ভূমিকা আছে সাহিত্য আর শিল্পের। বাইরের বন্ধন মানুষ সহজেই কাটতে পারে কিন্তু মনের বন্ধন কাটাই কঠিন। যে-শত্রুকে দেখা যায় তার সঙ্গে মোকাবিলা সহজ, কিন্তু অদৃশ্য আর অশরীরী শত্রুই সাংঘাতিক। দিনের আলোয় যারা ভূতের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না, রাতের অন্ধকারে তেমন মানুষকেও ভূতের ভয়ে দুরু দুরু বুক হতে দেখা যায়। মানুষের মনোরাজ্যে আর তার দিগদিগন্তে সাহিত্য আর ললিতকলা হচ্ছে দিনের আলো, দিনের আলোরও বেশী, কারণ দিনের আলোতেও যে-সব ভূত পলায় না, এ সব শিল্পের আলোয় সে সব ভূতও পালাবার পথ খোঁজে। মানুষের মন কতরকম ভূতের যে-আড্ডা তার কোন ইয়ত্তা নেই—ব্যক্তি, সমাজ, সম্প্রদায়, দেশ, জাতি, শাস্ত্র ও দেশাচারের হাজারো রকমের ভূত তথা সংস্কারের বন্ধনে মানুষের মন বাঁধা। ভয়, মোহ ও অহমিকা এ সব বাঁধনকে প্রায় অচ্ছেদ্য করে তোলে। সাহিত্য আর সব রকম শিল্পসাধনা হচ্ছে এ বাঁধন কাটার মন্ত্র। এ সব বাঁধন কাটাতে পারলে মুক্তবুদ্ধির দিনের আলোয় বিচরণ হয় সহজ। শিল্পসাধনাও হয় তখনই সার্থক। প্রকৃত Cultured বা সংস্কৃতিবান হওয়ার এ-ই পথ।

দেশের সংস্কৃতিসেবীরা অনেক বাধা-বিঘ্ন আর দুঃখদুর্দশার শিকারে পরিণত। তবুও বলবো মানবাত্মা অজেয়—শত বাধা-বিঘ্ন আর নির্যাতনেও তার পরাজয় নেই। এ বিশ্বাসের জোরেই মানুষ মৃত্যুঞ্জয়। এ বিশ্বাস মানুষের এক পরম সম্পদ। এ সম্পদ পড়ে পাওয়া বস্তু নয়, প্রতিদিনের সাধনা ও অনুশীলনের দ্বারা এ সম্পদকে জয় করতে হয়, রাখতে হয় সজীব আর সচল। এ রাখার জন্যই সংস্কৃতি-সাধনা—সব রকম ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে অবিচলিত চিত্তে তাতে আত্মনিবেদন করা।

ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র: এক অবাস্তব কল্পনা

গত বাইশ বছরেও শাসনতান্ত্রিক সংকট আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। বড় কারণ, দু'টি প্রবল অন্তরায় আজো আমাদের সামনে অনুত্তীর্ণ—তার একটি ভূগোল আর একটি ধর্ম। শেষোক্তটি অত্যন্ত কৃত্রিম ব্যাপার—কারণ ধর্ম আর রাজনীতিতে প্রায় অহি-নকুল সম্পর্ক। ধর্ম যেমন একদিকে সম্পূর্ণভাবে না হলেও প্রধানত পরলোক- বা পারলৌকিক জীবন-নির্ভর, তেমনি অন্য দিকে রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে ইহলৌকিক—ইহজীবন-সর্বস্ব। এ দু'য়ের সমন্বয় কিছুতেই হতে পারে না। পরলোক বা পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস ছাড়া ধর্ম অস্তিত্বহীন। কিন্তু ইহলোকে কোন রকম ধর্ম-বিশ্বাস বা ধর্ম-বিধান পালন ছাড়াও সৎ ও মহৎ জীবন যাপন করা যায়। তাই ধর্মহীন নাস্তিকের দলেও বহু সৎ, মহৎ আর সাধু-চরিত্রের লোকের অভাব নেই। বলা বাহুল্য, রাজনীতি আর দেশশাসন-ক্ষেত্রে এমন মানুষেরই প্রয়োজন আর মূল্য বেশী, রাজনৈতিক আর সামাজিক অর্থে অবিশ্বস্ত আর চরিত্রহীন (ইংরেজী অর্থে) তথাকথিত ধার্মিক বা ধর্মবিদের চেয়েও। আমি অন্য এক প্রবন্ধে বলেছি, ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর পর স্বর্গে গেল কি নরকে গেল সমাজ আর রাষ্ট্রের দিক থেকে তার এক কানাকড়ি মূল্যও নেই ; কিন্তু লোকটা জীবিতকালে, ইহলোকে সৎ ও বিশ্বস্ত ছিল কিনা, তার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে, বিশেষ করে সমাজের কাছে এবং তার প্রতিবেশীদের নিকট।

ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য আর প্রধান এলাকা পরলোক, পারলৌকিক জীবন, সে জীবনের জন্য শিক্ষা আর প্রস্তুতির ব্যবস্থা বিধান। অন্য দিকে রাষ্ট্রের শুধু প্রধান নয়, একমাত্র এলাকা ইহলোক, রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষের সুখ-সুবিধে, শান্তি আর উন্নয়নের ক্ষেত্র তৈরী করা—অর্থাৎ নাগরিকদের ইহজীবনের দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন। যে-রাষ্ট্র এ দায়িত্ব নিষ্ঠা আর সততার সঙ্গে পালন করে, সে রাষ্ট্রই আদর্শ রাষ্ট্র। তেমন রাষ্ট্রে যদি এক বিন্দুও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকে তেমন রাষ্ট্রকে আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান কিছুতেই মন্দ বা অযোগ্য রাষ্ট্র বলে নিন্দিত করবে না। বৃটিশ শ্রমিক দলের অন্যতম নেতা বিভান ছিলেন নিরীশ্বরবাদী,

কিন্তু বিশ্বাস করতেন মানবতায়—অর্থাৎ তিনি ছিলেন পুরোপুরি হিউম্যানিস্ট। রাজনৈতিক নেতা আর মন্ত্রী হিসেবে তিনি ছিলেন সৎ, আদর্শবাদী আর একনিষ্ঠ। মৃত্যুর পর এমন মানুষের জন্য ধর্মীয় প্রার্থনার কোন মূল্য নেই। সামাজিক রীতি রক্ষার জন্য আয়োজিত সার্ভিস ভাষণে তাঁর বন্ধু বিশপ ডক্টর মেরভিন স্টকউড বলেছিলেন, "বিভান নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, বিশ্বাস করতেন না ঈশ্বর কিংবা পরকালে, শ্রেফ বিশ্বাস করতেন মানবতায়। এমন মানুষের জন্য বাইবেল পাঠ শ্রেফ পরিহাস আর পাঠকের জন্য আত্মপ্রবঞ্চনারই সামিল। বিভান বাগাড়ম্বর আর আত্মপ্রতারণাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি যা ছিলেন না আমি যদি আজ তাঁকে তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করি তাতে তিনি মোটেও খুশী হতেন না।" গোঁড়া ধার্মিক খ্রীস্টান না হয়ে বিভান-যে মানবতাবাদী ছিলেন, তাতে বৃটিশ শ্রমিক দল, বৃটিশ গভর্নমেন্ট আর বৃটিশ জনগণের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি। যে-মানুষ মানবতা আর মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী সে মানুষ ঈশ্বর আর পরকালে বিশ্বাস না করলেও, বাক্যবাগীশ হয়ে জনগণকে প্রতারিত করতে যায় না। তাই নিরীশ্বরবাদী বিভান ইংলণ্ডের জনগণের কাছে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। রাজনৈতিক কর্মী আর নেতার কাছে মানুষ সুস্থ আর সৎ-রাজনীতিই কামনা করে, চায় না ধর্মবচন শুনতে। একমাত্র আমাদের দেশেই দেখা যায় নিজেদের রাজনৈতিক অজ্ঞতা ঢাকার জন্য আমাদের নেতারা অকারণেও ধর্মের বুলি আউড়িয়ে থাকেন।

এখানে বলে রাখা ভালো : ধর্মের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ বা অনীহা নেই। ইসলামের মধ্যেই আমার জন্ম—ইসলামকে আমি-যে শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি তাই নয়, আমার শিক্ষা-জীবনের সূচনা থেকে ইসলামী শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তাও আমাকে নিতে হয়েছে। কাজেই ধর্মের বিরুদ্ধে আমার কোন আপত্তি থাকার কথা নয়, নেইও। আমার আপত্তি যাঁরা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা বা শাসনতন্ত্র-রচনার দাবী করেন তাঁদের বিরুদ্ধে, তাঁদের বিরুদ্ধেও নয়, তাঁদের ঐ অবাস্তব দাবীর বিরুদ্ধেই।

ধর্ম এবং রাষ্ট্র. উভয়ের আয়ু সুদীর্ঘ—এ সুদীর্ঘকালে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কোথাও, কোন দেশে, কোন কালেই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এমনকি ইসলামের জন্মস্থান আরব দেশেও ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আজকের দিনের সৌদী আরবও ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র নয়—মিসর, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান, লেবানন তো নয়ই।

ধর্মের অনুশাসন আর বিধি-বিধান যেখানে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনের জন্য শাসনতান্ত্রিক আর আইন-সঙ্গত বাধ্যবাধকতা নেই তেমন দেশ বা রাষ্ট্রকে ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্র বলার কোন মানে হয় না। খোলাফায়ে রাশেদীনের দিনেও আরব দেশে এমন রাষ্ট্র চালু ছিল, সে কথা ইসলামের ইতিহাস বলে না। চালু থাকলে তিন তিনটা খলিফা দেশবাসীর হাতে নিহত হতেন না, এঁদের কেউ কেউ নিহত হয়েছেন মসজিদে, কেউ কেউ কোরানপাঠরত অবস্থায়। এ শুধু ইসলামের ব্যাপারে সত্য নয়; খ্রীস্টান, হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মের বেলায়ও এ দেখা গেছে। খ্রীস্ট-ধর্মের নির্দেশ- আর শিক্ষা-অনুযায়ী আজো কোথাও কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বরং প্রতিটি খ্রীস্টান রাষ্ট্রই খ্রীস্ট-ধর্মের মূর্তিমান প্রতিবাদ। রাম-রাজ্য কথাটাও অর্থহীন, স্রেফ এক স্বপ্ন কল্পনা। রামের দিনেও ভারতে রাম-রাজ্য ছিল না। থাকলে রামায়ণ অন্য ভাবে লিখিত হতো;—মহাভারতও। ধর্ম-রাজ্যে কুরুক্ষেত্রের মতো ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ ঘটে না। দেখা যেতো না মন্থরা কি কৈকেয়ীর মতো চরিত্র। ঘটতো না নারীহরণ (সীতাহরণ স্মরণীয়)। আসলে রাম-রাজ্য বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র স্রেফ এক ইউটোপিয়া, অবাস্তব এক কল্পরাজ্য। প্রাচীন কালে সব দেশেই সমাজ ছিল সরল, জটিলতা-মুক্ত, লোকসংখ্যাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগেরও তেমন চাপ ছিল না—তখন যা সম্ভব হয় নি আজকের দিনে তা সম্ভব এ কল্পনা করাও স্রেফ বাতুলতা। আমাদের দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রেও ধর্মের চেয়ে সস্তা আর লোক-ক্ষেপানো শ্লোগান আর নেই। তাই অনেকেই এ শ্লোগানের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। একমাত্র উদ্দেশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল। না হয় তাঁদেরও বুঝতে না পারার কথা নয়—আধুনিক মানুষ আর আধুনিক রাষ্ট্র এখন হাজারো সমস্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—আর এ বন্ধন তাবৎ বিশ্ব আর বিশ্ব-সমস্যার সাথে জড়িত। একক আর বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র এখন অকল্পনীয়। যে-রাষ্ট্র অনুন্নত অবস্থায় সকলের পেছনে পড়ে থেকে, সকলের মার খেয়ে খেয়ে, সব সময় অন্য রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকতে চায়—তেমন রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নভাবে কিছুকাল অস্তিত্ব রক্ষা করলেও করতে পারে। কিন্তু যে-রাষ্ট্র আধুনিক জীবন-জোয়ারে শরিক হয়ে আত্মসম্মান আর আত্মনির্ভরতার সাথে বাঁচতে চায় তার পক্ষে তা সম্ভব নয়। এমন রাষ্ট্রকে বিশ্বজ্ঞানের অংশীদার হতেই হবে—সে জ্ঞানের সঙ্গে যদি ধর্মের বিরোধও থাকে, তা হলেও সে জ্ঞান গ্রহণ না করে উপায় নেই। আধুনিক জীবনের

দাবী এত অপ্রতিরোধ্য যে, তাকে অস্বীকার করা মানে কূপমণ্ডুক হয়ে থাকা। পাকিস্তান আর পাকিস্তানীদের ভাগ্য এমন হোক এ আমরা চাই না।

আধুনিক জ্ঞান ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্র অসম্ভব। আধুনিক জ্ঞানের দুই যুগান্তকারী আবিষ্কার বিবর্তনবাদ ও মাধ্যাকর্ষণ—যা মানুষের হাতে এখন অসাধ্য সাধনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এ সবের সঙ্গে শাস্ত্রের কোন কোন বিধানের যে-বিরোধ নেই তা নয়। বিরোধ আছে বলেই হয়তো কিছুদিন আগে আমাদের এক ধর্মীয় নাম-চিহ্নিত ছাত্র সংস্থা পাকিস্তানের স্কুল-কলেজের পাঠ্য-সূচী থেকে 'বিবর্তনবাদ' বাদ দেওয়ার দাবী তুলেছিল। একেই বলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ। ধর্মকে রাজনীতির বিষয় করে তুললে, রাষ্ট্র-জীবনের বহু ক্ষেত্রে এমন অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। ধর্ম বলে : প্রাণীর ছবি তোলা কিংবা আঁকা নিষেধ। রাষ্ট্র বলে : তা ছাড়া হজ্ব করার পাসপোর্ট আমি দেব না। আর আর্ট কলেজ তুলে দিতেও আমি রাজি নই—কারণ আমার শিল্পী আর ডিজাইনারের দরকার।

ধর্ম বলে : বেশরা নাচগান নিষেধ। রাষ্ট্র বলে : তাই বলে বুলবুল একাডেমী তুলে দিতে আমি রাজি নই বরং দিতে থাকবো রাষ্ট্রীয় সাহায্য ঐ একাডেমীকে। ওটা উঠে গেলে বিদেশী মেহমানদের আমি দেখাবো কি ?

ধর্ম বলে : মদ হারাম। রাষ্ট্র বলে : আবগারী আয় ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বরং আমি আরো বেশী করে লাইসেন্স ইস্যু করবো। তা না হলে আমার উন্নয়ন কাজ বন্ধ থাকবে।

ধর্ম বলে : সুদ দেওয়া-নেওয়া হারাম। রাষ্ট্র বলে : আমার আরো ব্যাঙ্ক, আরো লোন চাই। সরকারী লোনের সুদ আরো বাড়াতে চাই আমি। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় বাজেটের দাবী মেটানো সম্ভব নয়।

শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের উদার ব্যাখ্যা দিয়েও কোন কোন সিনেমা চিত্রকে জায়েজ প্রমাণ করা যায় না, তেমনি নাম-মাত্র বস্ত্রখণ্ড-আঁটা বিদেশী নর্তকীদের নাচ-গানও, যা আমাদের বড় বড় হোটেলের হার-হামেশাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের দাবীদারেরা তো এসব স্থানে কিংবা মদ-গাঁজার দোকানে অথবা যেখানে প্রতিনিয়ত সুদ দেওয়া-নেওয়া চলছে সে সব ব্যাঙ্কের দুয়ারে গিয়ে পিকেটিং করেন না, দেন না সিনেমা যাত্রীদের বাধা। এঁরা তো একবারও দাবী

করেন নি স্টেট ব্যাঙ্ক তুলে দেওয়া হোক। আসলে এঁরাও মনে মনে জানেন, শাস্ত্রের চেয়ে রাষ্ট্র অনেক শক্ত। আর নকল ধার্মিকরা সব সময় শক্তের ভক্ত আর নরমের যম।

পৃথিবীতে সবরকম রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়—রাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষায় যত রকম রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ আছে কোথাও না কোথাও তার নিদর্শন দেখা যায়। কিন্তু কোথাও দেখা যায় না, খুঁজে পাওয়া যায় না ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর কোথাও যা কখনো ঘটে নি, সে অসম্ভব ঘটাতে হবে আমাদের এ পাকিস্তানে। অর্থাৎ এঁরা পাকিস্তানকে ঠেলে দিতে চান পেছনের দিকে, করতে চান পেছন-মুখী, যার পরিণতি আর একটা মধ্য-প্রাচ্যিক রাষ্ট্র। আশ্চর্য, এঁরা মাঝে মাঝে কায়েদে আজমের দোহাইও দিয়ে থাকেন, নিয়ে থাকেন তাঁরও নাম। এঁরা জানেন না যে, কায়েদে আজম প্রচলিত অর্থে ধার্মিক ছিলেন না মোটেও। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে, রাজনৈতিক ভাষণে তিনি কখনো ধর্মের নাম নেন নি। পাক-ভারতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ, কথাও বলেছেন সব সময় রাজনীতিবিদদের মতোই। তাঁর পাকিস্তান-আন্দোলনও ছিল পুরোপুরি রাজনীতিভিত্তিক। তাই ইসলামী রাষ্ট্র কথাটা তিনি কখনো ব্যবহার করেন নি। ১৯৪০-এর সুবিখ্যাত লাহোর প্রস্তাবে কোথাও ইসলামী বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের উল্লেখ নেই। ১৯৪২-এ সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা : "We have repeatedly declared that the cardinal principle and aim of the Muslim League is to safeguard the political rights and status of the Mussalmans of India." কাজেই-তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার- আর স্বার্থ-রক্ষা। ১৯৪৭-এর ১১ই আগস্ট পাকিস্তান সংবিধান সভায়ও কায়েদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : "Now, if we want to make this great State of Pakistan happy and prosperous we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people, and specially of the masses and the poor." ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের বিপদ কোথায়, তা তাঁর ভালো করেই জানা ছিল। তাই সে ভাষণেই তিনি বলেছেন : "We should begin to work in that spirit and in course of time all these angularities

of the majority and minority communities...will vanish." এও তিনি জানতেন হিন্দুদের মধ্যে যেমন নানা সম্প্রদায় ও শ্রেণী রয়েছে, তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও রয়েছে শিয়া-সুন্নী, আহমদী ইত্যাদি নানা সম্প্রদায় ও নানা মজহাব। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা বললে পরস্পরবিরোধী এ সব অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই। তিনি নিজেও ছিলেন পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ। তাই পশ্চিমী গণতন্ত্রের আদর্শভূমি গ্রেট বৃটেনের উল্লেখ করে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন গ্রেট বৃটেনের মতো : "...in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual but in the political sense as citizens of the State."

পাকিস্তান রাষ্ট্র-সম্বন্ধে যাঁর ধারণা ও বিশ্বাস এরকম, তেমন মানুষ কি কখনো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা ভাবতে কিংবা বলতে পারেন ?

শক্ত কেন্দ্র কেন এবং কার জন্য

এক

শক্ত কেন্দ্র মানে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকা আর সেখান থেকেই তা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। গত বাইশ বছর ধরে যা হয়ে এসেছে পাকিস্তানে। এমনকি তথাকথিত প্রাদেশিক বিষয়গুলির উপরও কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের নজির দেদার—এ সম্ভব হয়েছে কেন্দ্র অত্যন্ত শক্তিশালী বলেই। পূর্ব পাকিস্তানের বহু প্রকল্প যে বাস্তবায়িত হয় নি, আদৌ হয় না আর প্রায়ই হয়ে পড়ে এক দুর্লঙ্ঘ্য অচলাবস্থার সম্মুখীন, তার প্রধান কারণ এই 'শক্ত কেন্দ্র' তথা শক্ত কেন্দ্রের কর্তাদের কারসাজি। তবুও আশ্চর্য, আমাদের কোন কোন নেতা-উপনেতা এমনকি 'স্বল্পমেয়াদী' প্রাক্তন মন্ত্রীদেরও কেউ কেউ আজো শক্ত কেন্দ্রের জিগির তুলে থাকেন। শক্ত কেন্দ্র কেন? তার ফলে পাকিস্তানের সব অঞ্চলের মানুষ সমভাবে উপকৃত হয়েছে কিনা? হচ্ছে কিনা? হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা? এসব সঙ্গত জিজ্ঞাসার সম্মুখীন তাঁরা হন না, চান না হতে। এ-সম্বন্ধে তাঁদের অনীহা সুস্পষ্ট। কারণ, মানুষের ভালো-মন্দের দিকে তাকিয়ে এঁরা কথা বলেন না—কথা বলেন পাকিস্তানের যে-অঞ্চল শক্ত কেন্দ্রের ষোল আনার উপর আঠারো আনা সুযোগ-সুবিধে ভোগ করছে এবং ভবিষ্যতেও ভোগ করবে, সেখানকার মুষ্টিমেয় নবাবজাদা, পীরজাদা, মওলানাজাদা, মখদুমজাদা, খানজাদা প্রভৃতির মুখের দিকে চেয়েই। এঁরা জানেন, শক্ত কেন্দ্রের কর্ণধার যাঁরা তাঁরা সব ঐ অঞ্চলেরই মানুষ আর মন্ত্রিত্বের চাবিকাঠিও ওঁদের হাতেই। আমাদের এসব নেতা-উপনেতারা রাজনীতি করেন স্রেফ ঐ চাবিকাঠির দিকে তাকিয়েই। সত্যিকার অর্থে এঁরা রাজনীতিবিদ হলে রাজনীতির প্রথম সবকের সঙ্গে এঁদের পরিচয় থাকতো। সে সবক বা পাঠ হচ্ছে: রাষ্ট্রের অন্তর্গত সর্বাধিক মানুষের প্রভূততম কল্যাণসাধন। যে-কোন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য আর ফিলোসফি বা দর্শন এটিই। ইংরেজীতে যাকে বলা হয়

'গ্রেটেস্ট গুড টু দি গ্রেটেস্ট নাম্বার'। এর চেয়ে উন্নততর রাজনৈতিক দর্শন আবিষ্কৃত হতে এখনো বাকী। রাষ্ট্রের সব বিধি-বিধান আর নীতিকে এ মাপকাঠিতেই বিচার করে দেখাই যথার্থ দেখা। শক্ত বা নরম কেন্দ্রকেও বিচার করতে হবে এ মাপকাঠিতেই। এ মাপকাঠিতে গত বাইশ বছরের ইতিহাস আর তার খতিয়ান নিয়ে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, শক্ত কেন্দ্র প্যাকিস্তানের জন্যে মোটেও উপযোগী নয়। বৃহত্তর জনসংখ্যার সুযোগ-সুবিধের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে শক্ত কেন্দ্র পদে পদেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যেখানে বারো শ' মাইলের প্রাকৃতিক ব্যবধান, সেখানে শক্ত কেন্দ্র অচল। এ যাবৎ আমাদের শক্ত কেন্দ্রকে যে দিন দিন অধিকতর শক্ত করে তোলা হয়েছে তা স্রেফ গায়ের জোরেই। এতে বৃহত্তর জনসংখ্যার সম্মতি কোনকালেই ছিল না। বৃহত্তর জনসংখ্যা এর থেকে কোন ফায়দা পায় নি আজ পর্যন্ত। ভবিষ্যতেও শক্ত কেন্দ্র শক্ত রাখতে হলে গায়ের জোরেই রাখতে হবে। বৃহত্তর জনসংখ্যা-অধ্যুষিত অঞ্চলের যে-সব ক্ষুদে নেতারা শক্ত কেন্দ্রের জিগির তোলেন, তাঁরা পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষ ভাবে ঐ গায়ের জোরের প্রতিই সমর্থন যোগাচ্ছেন। এতে জাতি বা জাতির গরিষ্ঠ-সংখ্যক মানুষের ভালো করছেন না তাঁরা মোটেও।

দুই

গায়ের জোর আর গণতন্ত্র একসাথে চলে না। সার্কাসের খাঁচায় পোষা বাঘ আর পোষা ছাগলে সহ-অবস্থান চলে বটে, কিন্তু জীবন্ত আর জাগ্রত মানুষের দেশে গায়ের জোর আর গণতন্ত্রের সহ-অবস্থান অচল। সব মানুষই তার ভালো-মন্দ বোঝে—শক্তির জোরে এ ভালো-মন্দের চেতনাকে বেশী দিন দাবিয়ে রাখা যায় না। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাস তার এক জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। ক্ষমতার দাপটে যারা এতকাল ধরাকে সরা জ্ঞান করে এসেছে, আমার বিশ্বাস, এখন এদের নিকট-আত্মীয়েরাও তাঁদের রীতিমতো ঘৃণা আর কৃপার চোখে দেখে। জনগণের সেবা আর সম্মতির উপর নেতৃত্বের ভিত রচিত না হলে এমন অসহায় দশা সব শাসক আর নেতারই বিধিলিপি না হয়ে যায় না। শক্তি-প্রয়োগ তথা একনায়কত্ব মানব-স্বভাবের এত বিরোধী যে, তা কূটবুদ্ধি আর ডাণ্ডার সাহায্যে কিছুটা বিলম্বিত করা গেলেও দীর্ঘস্থায়ী করা যায় না কখনো। বরং তাকে যতই বিলম্বিত করা হয়, ক্ষমতার পক্ষে ততই তা হয়ে ওঠে

বিপজ্জনক। প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা আর অসন্তোষের দাবানলে এমন নেতৃত্বকে একদিন পুড়ে মরতেই হয়। ইতিহাসে এমন পরিণতির পুনরাবৃত্তি বারবারই দেখা গেছে। দুঃখের বিষয়, শক্তির ভক্তরা ইতিহাস পড়েন না। আমি রাজনীতিবিদ নই। আমার সব উচ্চাশা সাহিত্য-কর্মেই সীমিত। তবুও আইয়ুব খাঁ যখন ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হয়ে বসেন তখন একজন সাধারণ বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমার মনেও এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়েছিল। আমি বিচলিত হয়েছিলাম দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। আইয়ুব যে-পথ দেখালেন, যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন দেশের সামনে, তার থেকে সর্বনাশা পথ আর বিপজ্জনক আদর্শ আর হতেই পারে না। এ চিন্তা আমার মনের অসন্তোষকে দীর্ঘকাল ধূমায়িত করে রেখেছিল।

বর্তমান অবস্থায় স্বাধীন রাষ্ট্রে সামরিক বিভাগ এক অপরিহার্য অঙ্গ। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সঙ্গে এ অঙ্গের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, প্রায় অচ্ছেদ্যই বলা যায়। পাকিস্তানেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। পৃথিবীতে যতদিন যুদ্ধ থাকবে, ততদিন সব রাষ্ট্রে সামরিক বিভাগও থাকবে, থাকবে তার একজন সর্বময় কর্তা বা সর্বাধিনায়কও। যাকে বলা হয় সৈন্যাধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্ট হয়ে বসার আগে আইয়ুব যা ছিলেন। বলা বাহুল্য সৈন্যাধ্যক্ষরাও মানুষ, মানবীয় দুর্বলতা তাঁদেরও রয়েছে, থাকবে সব সময়—তাঁরাও অবাধ ক্ষমতা, শান-শওকত আর লোভ-লালসার উর্ধ্বে নন। তাঁর পরবর্তীরাও যদি পর্যায়ক্রমে তাঁর অর্থাৎ আইয়ুবের প্রদর্শিত পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করেন তখন দেশের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? সেদিন আমি মর্মাহত ও বিচলিত হয়েছিলাম শুধু এ কথাটা ভেবেই। না হয় রাজা-উজির নিয়ে মাথা ঘামানো আমার কাজ নয়। আইয়ুব-শাসন বহু কুকীর্তির জন্য খ্যাত—এ কুকীর্তিটাই বোধ করি দেশের প্রতি তাঁর চরম আঘাত। এজন্য তিনি চিরকাল জাতির ধিক্কারভাজন হয়ে থাকবেন।

তিন

গণতন্ত্রের পথেই আমাদের রাষ্ট্রের জন্ম। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় জীবনের শুরু আর যাত্রাও গণতন্ত্রের পথ বেয়েই। অবশ্য গণতন্ত্র-যে একদম নির্ভেজাল ভালো একথা বলা যায় না। ইংরেজ লেখক ই. এম. ফরেস্টর বলেছেন: "গণতন্ত্র

এখনো 'থি চিয়ার্স' পাওয়ার উপযুক্ত হয় নি, তবে 'টু চিয়ার্স' গণতন্ত্র দাবী করতে পারে।" মনে হয় কথাটা মিথ্যা নয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বজায় রেখে মানুষ আর সমাজের বিকাশের জন্য যতদিন এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর পন্থা আবিষ্কৃত না হচ্ছে ততদিন গণতন্ত্র ছাড়া আমাদেরও নান্যঃ পন্থা। বিশেষ করে ভৌগোলিক কারণে এছাড়া পাকিস্তানের জন্য অন্য কোন পন্থা ভাবাই যায় না। এ ক'বছরে দু দুটো সামরিক শাসন আমরা দেখলাম, কিন্তু সামরিক শাসন কোন অর্থেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয় বলে তাতে বৃহত্তর জনসংখ্যার কোন প্রতিফলন ঘটে নি। এও শক্ত কেন্দ্রের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ আর ফলশ্রুতি। এ ব্যবস্থা কিছুতেই জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের অনুকূল নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতারা গোড়া থেকেই এ সত্যটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তখন থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে গণতন্ত্রকে পাকিস্তানের লক্ষ্য ও আদর্শ হিসেবে। এমন কি গণতন্ত্রে যাঁদের বিশ্বাস নেই, তাঁরাও অবস্থার হেরফেরে পড়ে সব সময় গণতন্ত্রের বুলিই আউড়িয়ে থাকেন। যে-সব স্বেচ্ছাচারী একনায়করা এক কোপে গণতন্ত্রকে খতম করে দিয়ে নিজেরা রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেন, তাঁরাও হার-হামেশা কপচাতে থাকেন গণতন্ত্রের বুলি। কেউ কেউ আবার এসব স্বনির্বাচিত একনায়ককে 'খলিফা'দের সঙ্গে তুলনা করতেও শরম বোধ করেন না। বলেন, এ হচ্ছে 'ইসলামিক গণতন্ত্র'। ভূতের মুখে রাম নামের মতো 'গণতন্ত্র' কথাটা এঁরাও অহরহ জপ করে থাকেন। গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায়, পাকিস্তানেও যা বুঝে থাকি আমরা, সে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ইসলামের ইতিহাসে কখনো ছিল না। খলিফারাও গণভোটে নির্বাচিত হন নি। 'গণভোট' কথাটা আরব দেশে অজ্ঞাতই ছিল তখন। প্রতিটি আরব নাগরিক, এমন কি মক্কা-মদিনার সব নাগরিকও খলিফা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে নি। প্রধান প্রধান সাহাবারা যাঁর সম্বন্ধে একমত হয়েছেন, সবাই তাঁকেই খলিফা মেনে নিয়েছেন। যেদিন থেকে এ রেওয়াজ না-মানা শুরু, সেদিন থেকেই বিরোধেরও সূচনা। সে ইতিহাস অত্যন্ত শোচনীয়, রক্তাক্ত ও দীর্ঘ। ইসলামের ইতিহাসের পাঠকদের কাছে তা অজানা নয়। 'এক মানুষ (প্রাপ্তবয়স্ক) এক ভোট' এ নীতি ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন দেশে, কোন যুগেই অনুসৃত হয় নি। কাজেই 'ইসলামিক গণতন্ত্র' কথাটা স্রেফ এক সোনার পাথরবাটি। সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ারই এ এক ফন্দি!

পৃথিবীব্যাপী তাবৎ গণতান্ত্রিক দেশে এখন যে-গণতন্ত্র চালু আছে, দীর্ঘকাল ধরে যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং হচ্ছে, আমাদেরও সেই গণতন্ত্রের পথ ধরেই চলতে হবে। আমাদের যা কিছু রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাও এ গণতন্ত্রের পথেই অর্জিত। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণের সব রকম সুযোগ-সুবিধে গণতন্ত্রে রয়েছে। অধিকন্তু মানুষের অধিকতম কল্যাণসাধন গণতন্ত্রের পথেই সহজ ও সম্ভব। বলা বাহুল্য, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কারো কল্যাণ করা যায় না। সেভাবে করতে গিয়ে হিটলার তাঁর দেশের উপর আর নিজের উপর যে-চরম দুর্দিন ডেকে এনেছিল সে নজির সহজে ভোলবার নয়। গণতন্ত্র মানে জনগণের ইচ্ছে আর সম্মতি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিফলন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে পাকিস্তানেও শক্ত বা শক্তিশালী কেন্দ্র সমর্থন করা যেত। কিন্তু কেন্দ্র এখন যেখানে অবস্থিত সেখানে থাকলে তার সুদূর সম্ভাবনাও নেই। নবাবজাদা নসরুল্লাহ কিংবা কাইয়ুম খাঁ যখন শক্ত কেন্দ্রের কথা বলেন তখন তার অর্থ সহজেই বোধগম্য ; কিন্তু গত বাইশ বছরের হতাশা আর তিক্ত অভিজ্ঞতার পরও জনাব নুরুল আমিনেরা যখন শক্তিশালী কেন্দ্রের জন্য হা হুতাশ করেন তখনই তা আমাদের কাছে দুর্বোধ ঠেকে। শান্তি কিংবা যুদ্ধ কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের সর্বাধিক অধ্যুষিত অঞ্চল শক্তিশালী কেন্দ্র থেকে উপকৃত হয় নি মোটেও, এমনকি যুদ্ধের দিনে মানুস সাধারণ নিরাপত্তাও বোধ করে নি। শক্ত কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগটুকু পর্যন্ত হয়ে পড়েছিল বিচ্ছিন্ন সেদিন। হ্যাঁ, কেন্দ্রে তখন এ অঞ্চলের একজন যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন বটে! যাঁরা বৃহত্তর জনসংখ্যার নিরাপত্তা আর ভাল-মন্দ বাদ দিয়ে স্রেফ গোটা কয়েক মন্ত্রী নিয়ে—যে মন্ত্রীদের এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ সাবেক প্রেসিডেন্টের সামনে থরথর করে কাঁপতে দেখেছেন—সন্তুষ্ট থাকতে চান, শক্ত কেন্দ্রের ওকালতী একমাত্র তাঁদের মুখেই শোভা পায়। শুনেছি এক রাজধানী উন্নয়ন খাতে এ যাবৎ এই দরিদ্র দেশের প্রায় বারো শ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা যায়, 'এর শতকরা কতটুকু পাকিস্তানের সংখ্যাপ্রধান অঞ্চলের মানুষের হাতে এসেছে? অথচ বিরাট খরচের ভাগ তো এ অঞ্চলের মানুষকেও সমানে বইতে হয়েছে। অভিযোগ শোনা যায়: এখানে পুঁজি নেই, পুঁজি গড়ে উঠছে না। তাই শিল্পায়িত হচ্ছে না এ অঞ্চল। পুঁজি কি উল্কাপিণ্ড যে, আকাশ থেকে খসে পড়বে? রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে যে-বিপুল অর্থ খরচ করা হয় তা যে-অনুপাতে মানুষের হাতে

আসবে, সেভাবে, সেই অনুপাতেই তা দেশে আর জনগণের মধ্যে পড়বে ছড়িয়ে। সংখ্যানুপাতে তখনই তা দেখা দেবে পুঁজি হয়ে অর্থাৎ শিল্পকারখানার রূপ নিয়ে। রাষ্ট্রীয় তহবিলের বারো শ' কোটি টাকার যে-সুযোগ-সুবিধে একটা অঞ্চল পেল, অন্য অঞ্চলকে সে অনুপাতে কি সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়েছে? পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে পুঁজি আর জীবনমানের ভারসাম্য শক্ত কেন্দ্র এ ভাবেই তো দিনের পর দিন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সরকারী অর্থেই কর্ণফুলি পেপার মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানকার দরিদ্র সাধারণ যে-বাঁশ দশ বারো টাকা শ' কিনতো মিল প্রতিষ্ঠার পর এখন তা কিনছে পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর টাকা দিয়ে। অনেকে ঘরের বেড়া আর চালের ছাউনি দিতে পারছে না এ কারণে। কলমের এক খোঁচায় শক্ত কেন্দ্র মিলটা বেচে দিয়েছে এমন এক পুঁজিপতির কাছে যার সঙ্গে এ অঞ্চলের রক্ত-মাংসের কোন সম্পর্কই নেই। ফলে, দুর্ভোগের শিকার হয়েছে স্থানীয় জনসাধারণ ; কিন্তু মুনাফার স্রোত বয়ে চলেছে অন্য দিকে। কথায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়। পেটে না খেয়েই এ অঞ্চলের মানুষকে পিঠে সইতে হচ্ছে। কেন্দ্র শিথিল হলে এমন অবিচার কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তখন কেন্দ্রীয় সরকার এখানকার সাধারণ মানুষ আর প্রাদেশিক সরকারের কথা না শুনে পারতোই না। এ রকম অজস্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায় যা শক্ত কেন্দ্রেরই নতিজা। 'রূপপুর' নিয়ে যে-টালবাহানা চলছে সেও কি শক্ত কেন্দ্রের ফল নয়? শক্ত কেন্দ্রের শক্তি যেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেখানকার কোন্ প্রকল্প নিয়ে তো এমন টালবাহানা চলে, শোনা যায় নি!

চার

যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তখন খাদ্যে পূর্ব পাকিস্তান স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। শিক্ষায় অন্য অঞ্চল থেকে ছিল অধিকতর অগ্রগামী। সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি করতো এদেশের পাট—এখন টেবিল উল্টে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে কেন? আর তা একদিনে হয় নি। শক্ত কেন্দ্রের ভ্রান্ত আর একদেশদর্শী নীতিরই কি এ নতিজা নয়? পূর্ব পাকিস্তানী মন্ত্রী আর লাট-বেলাটেরা সব সময়, বিশেষ করে গত দশ বছর স্রেফ সাক্ষিগোপালের ভূমিকাই পালন করেছে। সংখ্যাপ্রধান অঞ্চলের মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা

উত্থাপন করা হলেই কেন্দ্রীয় সরকার বা তার মুখপাত্রদের পরিভাষায় তা হয়ে দাঁড়ায় 'প্রাদেশিকতা', 'আঞ্চলিকতা', 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' ইত্যাদি। কেন্দ্র অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলেই এমন অদ্ভুত পরিভাষার উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রের দুটি প্রধান স্তম্ভ: দেশরক্ষা আর অর্থনৈতিক বিভাগ। প্রথমোক্ত বিভাগে কিছুটা অতীত ইতিহাসের কারণেই হয়তো সংখ্যাপ্রধান অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব আজো নগণ্যই রয়ে গেছে। আমার নিজের বিশ্বাস—কেন্দ্রীয় সরকার তথা দেশরক্ষা বিভাগ যদি সদিচ্ছা আর সুপরিকল্পিত উপায়ে একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম নিয়ে ঐ বিভাগকে গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করতো, তা হলে সুদীর্ঘ বাইশ বছরেও অবস্থা এমন থাকার কথা নয়। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের কি ফায়দা হয়েছে জানি না, কিন্তু দেশরক্ষা বিভাগে সংখ্যা-প্রধান অঞ্চলের অবস্থা যে কতখানি হতাশাব্যঞ্জক, দেশের সামনে সে চিত্রটাই দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে দিয়েছে এই কেস্। জানি না, কেন্দ্রীয় সরকার বা দেশরক্ষা বিভাগ এর থেকে কোন সবক গ্রহণ করবে কি না। রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ অর্থবিভাগ। সেখানে অবস্থা আরো শোচনীয়। এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা সরকারী পরিসংখ্যানের সাহায্যেই সংখ্যাপ্রধান অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দিন দিন কিভাবে অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে তার শোচনীয় চিত্র দেশের সামনে বার বারই উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন। কিন্তু শক্ত কেন্দ্রের তাতে টনক নড়ে নি একটুও। কাগজ-কলম যেমন জড়বস্তু, তেমনি তার সাহায্যে রচিত গালভরা প্রকল্পগুলিও স্রেফ জড়বস্তুই। মানুষকেই দিতে হয় তার বাস্তবায়নের সুযোগ। দিতে হয় যে-অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রকল্প, সে অঞ্চলের মানুষকেই তার দায়িত্ব। আশ্চর্য দেশরক্ষা বিভাগ যেমন অর্থ বিভাগও এ পর্যন্ত সংখ্যাপ্রধান অঞ্চলের কারো হাতে ন্যস্ত হয় নি। অথচ শুনি খাঁটি অর্থনীতিবিদের আবির্ভাব এ অঞ্চলেই বেশী হয়েছে—পাকিস্তানের সেরা অর্থনীতিবিদরা সবাই নাকি এ অঞ্চলেরই মানুষ। তবুও ঐ বিভাগ আজো সংখ্যালঘু অঞ্চলের খাস তালুক হয়েই আছে উপযুক্ত লোকের অভাবে, এ অভিযোগ ধোপে টেকে না। এ অভিযোগ আর সাফাই দিয়ে দিয়েই একদিন হিন্দুরা পাকিস্তান দাবীর ক্ষেত্র নিজের হাতেই তৈয়ার করে দিয়েছিল। আসলে এসবই শক্ত কেন্দ্রের কারসাজি। শক্ত কেন্দ্রেরই ফলাফল। এমনকি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন একটা সংস্থার কর্তৃত্বও সংখ্যাপ্রধান অঞ্চলের মানুষের হাতে

এযাবৎ দেওয়া হয় নি। নবাবজাদা নসরুল্লাহ-নুরুল আমিন-কাইয়ুম খাঁ-রা এ সম্বন্ধে কোনদিন উচ্চবাচ্য করেছেন কি? মওলানা মওদুদীও কি একবারও জিজ্ঞাসা করেছেন পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস্ চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে সংখ্যাপ্রধান অঞ্চলের কাকেও নিয়োগ করা হয় না কেন? আশ্চর্য তাঁর কথিত 'ইসলামী ন্যায় বিচার' এ সম্পর্কে একদম খামোশ।

গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি তথা পার্লিয়ামেন্টারি সিস্টেম যখন দেশে চালু ছিল তখন একটা কনভেনশন বা রেওয়াজ মেনে নেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে পর্যায়ক্রমে এক একবার করে পূর্ব পাকিস্তানী আর পশ্চিম পাকিস্তানী নিয়োগ করা হবে। এ যাবৎ একজন মাত্র পূর্ব পাকিস্তানী পুরোমুদ্দত চেয়ারম্যানের পদে থাকার সুযোগ পেয়েছেন। কেন্দ্র যখন অধিকতর শক্ত হয়ে উঠেছে তখন ঐ সুস্থ রেওয়াজটাকেও দেওয়া হয়েছে হাওয়ায় উড়িয়ে। শক্ত কেন্দ্রের প্রবক্তারা এ-সম্বন্ধেও কোনদিন টুঁ শব্দও করেন নি।

এ প্রবক্তাদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে আমাদের পিঠ চাপড়িয়ে বলে থাকেন, পূর্ব পাকিস্তানীরা অতি ভালো মুসলমান। তারা একাধিক পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাকে জাতীয় পরিষদের সদস্য পর্যন্ত নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু মিয়া ভাইরা একটিবারও এর বিপরীত কোন নজির দেখান নি। অর্থাৎ বলেন নি যে, আমাদের অঞ্চল থেকেও আমরা অমুক অমুক পূর্ব পাকিস্তানীকে নির্বাচিত করেছি। ভাবটা এই, তোমরা দেবে আমরা নিয়ে তোমাদের কৃতার্থ করবো। 'ইসলামী ভ্রাতৃত্ব'-এর অপূর্ব নজির বটে!

পাঁচ

রাষ্ট্রের কেন্দ্রশক্তি সংখ্যাপ্রধান অঞ্চলেই তো প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তা হলে 'অধিকতম মানুষের অধিকতম উপকার করা' সহজ হতো। শক্ত কেন্দ্রের প্রবক্তারা এ উচিত কাজটি করতে এবং প্রয়োজন হলে এর সপক্ষে আন্দোলন করতে রাজী আছেন কি? তা যদি রাজী হন, অর্থাৎ কেন্দ্র যদি দেশের সংখ্যা-প্রধান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা হলে ষোল আনা কেন, বত্রিশ আনা শক্ত

কেন্দ্র মেনে নিতেও আমরা প্রস্তুত। 'সর্বাধিক মানুষের তথা মুসলমানের উপকারসাধন' যদি পাকিস্তানের লক্ষ্য ও আদর্শ হয়, এ করলেই তা সহজে হাসিল করা সম্ভব হবে। কিন্তু এমন ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবে সংখ্যালঘু অঞ্চলের শতকরা একজনও রাজী হবে কি? রাজী হবেন কি ওদের নেতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ, আবদুল কাইয়ুম খান, আর মওলানা মওদুদীরা? আমি জানি, রাজী হবেন না। 'ইসলামী ন্যায়বিচার'-এর কথা যাঁরা হার-হামেশা বলেন, তাঁরা এ ন্যায়বিচারের কোন ব্যাখ্যা আজো দেন নি। তাই সংখ্যাপ্রধান অঞ্চলের সংখ্যা-প্রধান মুসলমান মানুষের প্রতি ন্যায়বিচারকে এঁরা 'ইসলামী ন্যায়বিচার' বলে স্বীকার করেন কিনা আজো জানা যায় নি। করলে এ বিষয়ে তাঁদের কণ্ঠ অন্তত সোচ্চার হতো। 'ইসলামী ন্যায়বিচার' হাওয়াই বস্তু হয়ে থাকলে কার কি ফায়দা?

শক্ত কেন্দ্রের শক্তির দাপটে যখন সারা দেশ থরথরি কম্পিত, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে কয়েক শ' পূর্ব পাকিস্তানী আদম-সন্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, ভালো কৃষি জমি আর গরু-বাছুর দিয়ে ওদেরে ওখানে বসতি স্থাপনের সুযোগ দেওয়া হবে। শক্ত কেন্দ্রের আশ্বাস পেয়ে ওরা নিজেদের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি, গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগি যার যা ছিল সব বিক্রি করে দিয়ে একরকম ফতুর হয়েই পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে আশ্রয় নিতে ছুটে গিয়েছিল। এই কয়েক শ' হতভাগ্য আদম-সন্তানের ভাগ্যে পরে কি ঘটেছিল, সে ইতিহাস আজ কারো অজানা নয়! কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্করুণ ঔদাসীন্য আর অবহেলায় এরা স্রেফ পথের ভিখারী হয়েই—যারা প্রাণে বেঁচেছিল, তারা আবার নিজেদের 'পাকওয়াতনে' ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার একটু 'হুঁ' করলেই এ মানুষগুলির এমন দুর্দশা ঘটতো না—সহজেই ওরা সেখানে বসতি স্থাপন করে মানুষের জীবন যাপন করতে পারতো। কেন্দ্র অত্যন্ত 'শক্তিশালী' বলেই কতকগুলি অসহায় নাগরিককে নিয়ে এমন পিংপং খেলা সম্ভব হয়েছে। 'শিথিল' কেন্দ্র হলে এ কখনো সম্ভব হতো না। শক্ত কেন্দ্র আর ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রবক্তারা সেদিনও কেন্দ্রীয় সরকারের এমন অমানবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি টুঁ শব্দও করেন নি। 'ইসলামী ভ্রাতৃত্ব' কথাটা এ হতভাগ্য লোকগুলির জীবনে স্রেফ একটা প্রচণ্ড প্রহসন বলেই কি প্রমাণিত হয় নি? সামরিক আর আর্থিক ক্ষেত্রে

শক্ত কেন্দ্রের ব্যর্থতার প্রতি উপরে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানবিক ব্যাপারেও তার ব্যর্থতা এ সামান্য কয়েক শ 'বসবাসকারী'র বেলায় অত্যন্ত নগ্ন মূর্তিতেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশরক্ষা ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পূর্ণ পৃথক। কাজেই দেশরক্ষা তথা সামরিক বিভাগ যদি দুই অঞ্চলের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়, তা হলে সংকট মুহূর্তে তা কোনরকম কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারবেই না। গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তা সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, বৈদেশিক বাণিজ্যও যদি কেন্দ্রের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়, তা হলে কেন্দ্র চলবে কি করে? উত্তরে বলা যায়, প্রদেশগুলির আয় অনুসারে একটা নির্দিষ্ট কোটা কেন্দ্রকে দেওয়ার ব্যবস্থা হলেই সহজে এর সুরাহা হয়। ফেডারেল সিস্টেমে এ নিয়ম সর্বত্র চালু। অথবা এও করা যায়, কেন্দ্রীয় বাজেট যদি আনুমানিক দু'শ কোটি টাকা ধার্য হয় বা যাই ধার্য হোক তার আধাআধি দুই অঞ্চলই ,যোগাবে, যোগাতে বাধ্য থাকবে। এসব এমন কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। আপসে আলাপ-আলোচনার মারফত এসব ব্যাপারে সহজেই একটা সমঝোতায় আসা যায়। গত বাইশ বছরে এটা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, শক্ত কেন্দ্র পাকিস্তানের জন্য মোটেও উপযোগী নয়—এতে সর্বাধিক নাগরিকের কল্যাণ সাধন হয় না, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মাত্রেরই আদর্শ। এ আদর্শ ভ্রষ্ট হলে গণতন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের দেশে যে ব্যর্থ হয়েছে, তা বলার প্রয়োজন রাখে না।

মানুষ অর্থনৈতিক জীব। ধর্মীয় জীব নয় কোন অর্থেই। ধর্মের ষাঁড় শুধু পশুর বেলায় ব্যবহৃত হয়—মানুষের বেলায় প্রয়োগ করা হলে তা রীতিমত গাল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ অর্থনৈতিক শেকলেই বাঁধা। এ যুগে বন্ধন আরো সর্বব্যাপক। এখন টাকা ছাড়া জন্মানো যায় না নিরাপদে, যায় না একটু ভদ্রভাবে কবরে যাওয়াও। অর্থ ছাড়া উন্নতি-উন্নয়ন কিংবা সুখ-সমৃদ্ধির কথা তো অকল্পনীয়। তাই সব রাষ্ট্রের বুনিয়াদ এখন সুষ্ঠু অর্থনীতির উপরই নির্ভরশীল—তার মানে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধের সমবণ্টন। সব অঞ্চলের সব মানুষের না হলেও অন্তত বৃহত্তর জনসংখ্যার সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা করা, সেভাবে রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে গড়ে তোলা, রাষ্ট্রের সব সম্পদকে সেভাবে বিতরণের শাসনতান্ত্রিক বিধি-বিধান প্রয়োগ করা। ঐসব বিধি-বিধান প্রতিদিনের আইনের আওতায়

নিয়ে আসা না হলে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাও প্রহসনে পরিণত না হয়ে যায় না —যেমন পূর্বতন শাসনতন্ত্রের সংখ্যাসাম্য নীতি পরিণত হয়েছে। সাবেক সরকারের আমলে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সে সরকারের চুনোপুঁটি পর্যন্ত সবাই সব সময় গলা ফাটিয়ে বলে বেড়াতো সব ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য বজায় রাখা সরকারের শাসনতান্ত্রিক পবিত্র দায়িত্ব। 'পবিত্র' বলেই বোধ করি তা পদে পদে লঙ্ঘিত হতো। এমনকি, স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানও যে এ নীতি লঙ্ঘন করেছেন তার প্রমাণ জাতীয় পরিষদের কার্য-বিবরণীতেও লিপিবদ্ধ রয়েছে। কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মনোনয়ন পাওয়ার পরও এ অঞ্চলের কেউ কেউ যে চাকুরি পায় নি এবং মনোনয়ন না পেয়েও অন্য অঞ্চলের কেউ কেউ যে চাকুরি পেয়েছে, তার নজিরেরও অভাব নেই জাতীয় পরিষদের কার্যবিবরণীতে। শক্ত কেন্দ্রের এই তো মহিমা! দেশের সংখ্যাপ্রধান অঞ্চল এ যাবৎ এ অন্যায়ের কোন প্রতিকার করতে পারে নি—শক্তিশালী কেন্দ্র অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতেও পারবে না। কাজেই শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব বা 'পবিত্রতা'র এক কানাকড়ি মূল্যও নেই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যা কিছু মূল্য তা আইন আর আইনের বাধ্যবাধকতার। সংখ্যাসাম্য ব্যাপারে স্রেফ 'দায়িত্ব'-এর দোহাই দেওয়া হতো; কিন্তু আইনগত বাধ্য-বাধকতা ছিল না কারো উপর। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বিভাগে কিংবা দফতরে যদি এ 'দায়িত্ব' লঙ্ঘিত হতো তার জন্য সে বিভাগ আর দফতরের নিয়োগকর্তাদের আইনের কাছে করতে হতো না কোন জবাবদিহি। আজও হয় না। 'কাজেই কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম'-নীতিই চালু ছিল এবং আজো আছে। যে দেশে প্রতিনিয়ত অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারি হয়, সেখানে এ সম্পর্কে আজো কোন অর্ডিন্যান্স জারি হলো না কেন?

সংখ্যাসাম্যের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্বকে বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা বার বার দাবী জানিয়েও ব্যর্থকাম হয়েছেন। তাঁদের সব দাবী-দাওয়া অরণ্যরোদনে পরিণত হয়েছে। এর একমাত্র কারণ শক্ত কেন্দ্র এতই শক্ত যে, সেখানে সংখ্যাপ্রধান অঞ্চলের দাঁত ফোটাবার সাধ্য নেই। শক্ত কেন্দ্র এতকাল শুধু কথা দিয়েই চিড়া ভিজিয়েছে—চিড়া ভিজেছে কিনা সে খবর এদেশের শিক্ষিত জনসাধারণের ভালো করেই জানা। এখনো শক্ত কেন্দ্রের বুলি যাঁরা আওড়াচ্ছেন তাঁদেরও যে এ তথ্য জানা নেই, তা নয়। মনে হয় সার্কাস

মালিকের সুন্দরী মেয়েটার পা ফসকে পড়ার আশা তাঁরা কিছুতেই ছাড়তে পারছেন না, তাই পায়ের তলার মাটির দিকে না তাকিয়ে তাঁরা তাকিয়ে আছেন দোদুল্যমান রিঙের দিকে। বাইশ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে এভাবে ভুলে গিয়ে যে-হাওয়াই রাজনীতি, তাতে আর যাই থাক, দূরদর্শিতার পরিচয় নেই।

পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে শক্ত কেন্দ্রের সপক্ষে জনাব নুরুল আমিনের কণ্ঠস্বরই যেন সবচেয়ে সোচ্চার। অপ্রিয় হলেও এ সত্য যে, এ অঞ্চলে গণতন্ত্রের মাথায় প্রথম কোপটা জনাব নুরুল আমিনই দিয়েছিলেন—তাঁর সময়. তিনি পঁচিশটা কি ছাব্বিশটা উপনির্বাচন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, পাছে নিজের গদিটা টলটলায়মান হয়ে ওঠে এই ভয়ে। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন এ প্রদেশের চীফ্ মিনিস্টার। কেন্দ্রীয় সরকার এ আন্দোলনটাকে সমূলে খতম করে দেওয়ার জন্য সেদিন তাঁকেই ব্যবহার করেছিল ওদের হাতল আর হাতিয়ার হিসেবে। হাতটা ওদের হলেও কোপটা তাঁরই ছিল। এখন জীবন-সায়াহ্নে তিনি যেন ফের নবাবজাদা আর খানজাদাদের হাতের হাতিয়ার হয়ে এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের মাথায় আর একটা কোপ দিয়ে না বসেন! তাঁর প্রতি আমাদের এ সনির্বন্ধ অনুরোধ। গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থে আমি মনে করি: সর্বাধিক মানুষের অধিকতম উপকার। শক্তিশালী কেন্দ্রে এ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কেন্দ্রীয় রাজধানী বনাম পূর্ব পাকিস্তান

রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের রাজধানীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বলা বাহুল্য রাষ্ট্র মানে রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষ। এ মানুষকে বাদ দিয়ে বা তাদের ভালো-মন্দের কথা উপেক্ষা করে রাষ্ট্রের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। গায়ের জোরে করা হলে তা যে শুধু কায়েমী আর স্থিতিশীল হয় না তা নয়, বরং তা ডেকে আনে বহু অবাঞ্ছিত অসন্তোষ, বিরোধ, অশান্তি আর সংঘর্ষও। যা কালক্রমে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বেরও হয়ে দাঁড়ায় অন্তরায়। আজকের দিনে রাজধানী মানে রাজার কিংবা প্রধান রাজপুরুষের বাসস্থানকে বোঝায় না। এখন রাজধানী মানে দেশ, জাতি আর রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড—জাতি আর রাষ্ট্রের সব রকম জীবন-স্রোতের উৎস। রাষ্ট্রের সব অঞ্চল আর সব অঞ্চলের মানুষ, অন্তত অধিকাংশ মানুষ যদি এ স্রোতের নাগাল না পায় তার সঙ্গে একাত্ম হতে না পারে, আর এ স্রোতকে যদি ইচ্ছে করে, জনসংখ্যার অধিকাংশের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে রাষ্ট্র ভারসাম্য না হারিয়ে থাকতে পারে না—ভারসাম্য হারানো মানে গোটা রাষ্ট্র-দেহের দুর্বল আর পঙ্গু হয়ে পড়া। মানব-দেহের রক্তস্রোতের মতো রাষ্ট্র-দেহের জীবনস্রোতও রাষ্ট্রের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সমভাবে প্রবাহিত হওয়া চাই। তেমন রাষ্ট্রই গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠার সুযোগ পায় সুস্থ আর স্বাভাবিক পথে। আগের দিনে রাষ্ট্র-শক্তি সম্পূর্ণভাবে রাজধানী-কেন্দ্রিক ছিল, ফলে রাজধানীর পতন হলে রাষ্ট্রেরও পতন ঘটতো। এখন আর তা নয়। এখন প্রতি নাগরিকই রাষ্ট্রের এক একটা খুঁটি। প্রতি অঞ্চলই রাষ্ট্রের অংশীদার। এখন শুধু রাজধানী জয় করে সারা দেশ বা রাষ্ট্রকে জয় করা যায় না। মানুষের সার্বিক আনুগত্য ছাড়া আজকের দিনে সামরিক জয় তেমন কোন বড় কথা নয়। গত বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেছে, প্যারীর পতনে ফ্রান্সের পতন ঘটে নি। তেমন জয় যে অচিরে সার্বিক পরাজয়ে পরিণত হয় তাও ঐ যুদ্ধেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। তাই স্রেফ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দিক দিয়ে রাজধানীর আজ আর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। এখন রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি আর নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মানুষ, মানুষের সম্মতি,

আনুগত্য, সহযোগিতা আর অংশীদারিত্বের উপর। এছাড়া রাষ্ট্রীয় সংহতি আর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কিছুতেই অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। এখন শুধু সৈন্যবাহিনী দেশ আর দেশের আজাদী রক্ষা করে না, রক্ষা করে জনতা, দেশের আপামর নাগরিক। তাই ওদের অংশগ্রহণ, অংশগ্রহণের সুযোগ আর সহযোগিতা অত্যাবশ্যক, যার উৎস-মুখ রাজধানী। কারণ সব রকম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ-উদ্যম আর সিদ্ধান্তের কেন্দ্রবিন্দু ঐখানেই ন্যস্ত এখন। আমি অন্য এক প্রবন্ধে বলেছি, 'রাষ্ট্রের অধিকতম মানুষের সর্বাধিক কল্যাণসাধনই' সর্বোত্তম রাষ্ট্রীয় আদর্শ। রাষ্ট্রের সব রকম সিদ্ধান্ত আর নীতি এ আদর্শের মাপকাঠিতেই বিচার্য। রাজধানীর ব্যাপারেও প্রয়োগ করতে হবে এ মাপকাঠি। রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হলো কি হলো না—এ মোটেও প্রধান বিবেচ্য নয়। প্রধান বিবেচ্য সর্বাধিক নাগরিকদের নাগাল আর অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধে। আমাদের রাজধানী সমস্যাও সেদিক থেকেই বিচার করে দেখতে হবে। এ বিচার করা হয় নি বলে কালক্রমে বহু সমস্যা, বহু অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পাকিস্তানে। আইয়ুব-শাসন সম্পূর্ণভাবে একনায়কত্ব-নির্ভর শাসন ছিল। ফলে জনমত বা জনগণের কল্যাণের কথা ঐ শাসনের আমলে কোন আমল পায় নি। করাচী থেকে রাজধানী যে কলমের এক আঁচড়ে ইসলামাবাদের পার্বত্য এক ঊষর-ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—যার পেছনে এ দরিদ্র রাষ্ট্রের কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তাও স্বৈরাচারী নির্বুদ্ধিতার এক চরম নিদর্শন। এ কিছুমাত্র যুক্তি কিংবা শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। ব্যক্তিগত কোন দুরভিসন্ধিরই এ কারসাজি। এর ফলে করাচীতে বিপুল অর্থব্যয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে—আমার বিশ্বাস ইসলামাবাদের অকল্পনীয় অর্থব্যয়ও একদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়ে যায় না। জনমত দীর্ঘদিন চাপা থাকে না, চেপে রাখা যায় না—ইতিহাসে এ বার বারই প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তানের বৃহত্তর জনসংখ্যার ইসলামাবাদে পৌঁছানোর, সেখানকার কোন সুযোগ-সুবিধে ভোগের কোন উপায়ই নেই।

সেখানে রাষ্ট্রীয় তহবিলের যে-অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে ও হচ্ছে—ভবিষ্যতেও হবে যদি না এ তোগলকী পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়—তার ফল আর সুযোগ-সুবিধে চিরকালই বৃহত্তর-সংখ্যক নাগরিকের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। ফলে ভেতরে ভেতরে যে-অসন্তোষের বহ্নি এখন ধিকি ধিকি জ্বলছে, তা যে একদিন প্রচণ্ড দাবানলের রূপ নেবে না, তা কে বলতে পারে? পাকিস্তানের বৃহত্তর

জনসংখ্যা-অধ্যুষিত এলাকা কখনো ইসলামাবাদকে রাজধানী হিসেবে মেনে নেয় নি—তাদের সম্মতি চাওয়াও হয় নি কোন দিন, এ এক সম্পূর্ণ 'আরোপিত' সিদ্ধান্ত। দিন দিন প্রত্যেক এলাকার মানুষ যেভাবে স্বার্থ-সচেতন হয়ে উঠছে, তাতে মনে হয় ভবিষ্যতে শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, অন্যান্য এলাকাও, যেমন সিন্ধু, বেলুচিস্তান তা প্রভৃতিও মানবে না, কিছুতেই ইসলামাবাদকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করে নেবে না নিজেদের রাজধানী হিসেবে। রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ ব্যয় করা হবে অথচ রাষ্ট্রের সর্বাধিক মানুষ তার থেকে কোন ফায়দা পাবে না, এমন বিসদৃশ অবস্থা কখনো মানুষ মেনে নিতে পারে না। যে-মুহূর্তে মানুষ সত্যিকার বাক্-স্বাধীনতা ফিরে পাবে—জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যেদিন স্বাধীনভাবে কথা বলার আর মতামত দেওয়ার অধিকার অর্জন করবে, জাতির প্রতি এত বড় অবিচার তারা সেদিন কিছুতেই নীরবে বরদাশত করবে না।

দুই

শুধু দূরত্বের দিক দিয়ে নয়, আবহাওয়া আর পরিবেশের দিক থেকেও ইসলামাবাদ পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। রাজধানী সব সময় জনগণকে আকর্ষণ করে থাকে, শুধু-যে বিত্তবানেরাই রাজধানীতে ভিড় জমায়, তা নয়—সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী আর সংস্কৃতি-সেবকরাও একটা দুর্বার আকর্ষণ বোধ করেন দেশের রাজধানীর প্রতি। এভাবে রাজধানী হয়ে ওঠে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চারও প্রধান কেন্দ্র। যেমন কলিকাতা, দিল্লী, লণ্ডন, প্যারী হয়ে উঠেছে। আজাদীর পর আমাদের নতুন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে—ঢাকা-করাচী-লাহোর। ইসলামাবাদে তা হয়ে ওঠার কোন সম্ভাবনাই নেই। দালান-কোঠার জন্য যেমন ইট-সিমেন্ট-বালি ইত্যাদি উপকরণের প্রয়োজন, তেমনি সাহিত্য-শিল্পের জন্যও উপকরণ চাই। বলা বাহুল্য, সে উপকরণ মানুষ, মানুষের জীবন, তার প্রতিদিনের জীবনাবর্ত। অশ্রু আর স্বেদসিক্ত জীবনের যন্ত্রণা ছাড়া আজকের দিনে সাহিত্য-শিল্প কল্পনাই করা যায় না। ইসলামাবাদের জীবন গণ্ডী-বদ্ধ, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত—ভৌগোলিক কারণে এর বাইরে জীবনের প্রসার আর বিস্তৃতি ওখানে কল্পনাই করা যায় না। ওখানকার সমস্যা আর 'জীবন-যন্ত্রণা' অর্থ, ক্ষমতা আর যৌনতায় সীমিত হয়ে থাকতে বাধ্য। ওখানে জন- বা গণ-জীবনের চেহারা কখনো দেখা দেবে না। জীবনের রক্ত-প্রবাহ যেখানে নেই,

সেখানে বসে যে-সাহিত্য রচিত হবে তা ফ্যাকাশে, রক্তহীন আর পাণ্ডুর না হয়ে যায় না। ইসলামাবাদ কখনো জনাকীর্ণ শহর কি নগর হয়ে উঠবে না—গড়ে উঠবে না ওখানে কোন কলকারখানা কিংবা কৃষি। পাকিস্তানের শতকরা নব্বই জন মানুষ হয় কৃষক না হয় শ্রমিক—তাদের জীবন-স্রোতের সঙ্গে তাদের রাজধানীর থাকবে না কোন সংযোগ। বন্দর-বিচ্ছিন্ন স্থান কখনো সমৃদ্ধ আর জীবন-জোয়ারে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে পারে না। যে-হতভাগ্য দেশকে প্রকৃতি নদ-নদী, সমুদ্র আর বন্দর থেকে বঞ্চিত করেছে, সে দেশের কথা স্বতন্ত্র। পাকিস্তান তেমন কোন হতভাগ্য দেশ নয়। ভাগ্য আর প্রকৃতি আমাদেরে চমৎকার সামুদ্রিক বন্দর হাতে তুলে দিয়েছে—অথচ আমাদের শাসকরা সে বন্দর ছেড়ে আশ্রয় খুঁজছেন উষর এক মরুভূমিতে।

দেশের দুই বড় সম্পদ সমুদ্র আর মাটির উর্বরতা—ইসলামাবাদ এ দুই সম্পদ থেকেই বঞ্চিত। কোটি কোটি টাকার অপব্যয়েও সমুদ্র কখনো ওখানে প্রবাহিত হবে না—ওখানকার ভূমি হবে না চাষের উপযোগী। জাতীয় স্রোত চিরকালই ওখানে বন্ধ্যা হয়ে থাকবে। কাজেই এ অপব্যয় যত শীগগির বন্ধ হয়, ততই জাতির পক্ষে মঙ্গল। সমুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকেও যে কিভাবে সমৃদ্ধ ও বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করে তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত বৃটেন, জাপান রাষ্ট্র। গত দশ-বারো বছর ধরেও যদি অবিচ্ছিন্নভাবে করাচীতে রাজধানী থাকতো, তা হলে এতদিন করাচীর চেহারাই বদলে যেতো—যে-বিপুল অর্থ ইসলামাবাদের কঙ্করিস্তানে ঢালা হয়েছে ও হচ্ছে, তার অর্ধেক অর্থ করাচীতে ব্যয় করা হলে করাচী অচিন্তনীয়ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো। সব চেয়ে বড় কথা রাষ্ট্রের সব অঞ্চলের মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিও করাচীর জন-জীবনে প্রতিফলিত আর অনুভূত হতো যা ইসলামাবাদে কস্মিন্‌কালেও হবে না, হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

বৈষয়িক আর আর্থিক সুযোগ-সুবিধে ছাড়াও রাজধানীর সঙ্গে মানুষের আবেগ অনুভূতিরও একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবেগ-অনুভূতিও কিছুমাত্র উপেক্ষণীয় নয়। আবেগ-অনুভূতিই মানুষকে নিয়ে যায় ব্যক্তিগত স্বার্থ-চেতনার উর্ধ্বে—এ আবেগ-অনুভূতির সংহত রূপেরই এক নাম দেশপ্রেম। এর ফলেই দেশ আর দেশের নিরাপত্তা রক্ষা মানুষের কাছে হয়ে ওঠে এক পবিত্র দায়িত্ব। তখন দেশের জন্য প্রাণ দিতেও সে দ্বিধা করে না। গত বিশ্বযুদ্ধে হিটলার বাহিনীর গতিরোধ করতে গিয়ে এক লেনিনগ্রাডের চারপাশে লক্ষ লক্ষ

রুশ প্রাণ দিয়েছে। লণ্ডন-প্যারীর মানুষও কি কম ত্যাগ স্বীকার করেছিল সেদিন? ইসলামাবাদ কি আমাদের এ আবেগ-অনুভূতি দাবী করতে পারে? যে-ইসলামাবাদের সঙ্গে দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যার কোন সম্পর্ক নেই, দৈহিক কি মানসিক, তার জন্য মানুষের চরম ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা নয়।

তিন

একমাত্র করাচীই সমগ্র জাতির আবেগ অনুভূতির দাবী করতে পারে—পারার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত পাকিস্তানের স্বাধীনতা-সনদ করাচীতেই সর্বপ্রথম ঘোষিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত যাঁকে আমরা জাতির পিতারূপে অভিহিত করছি, সেই কায়েদে আজমের জন্মস্থান করাচী এবং তিনি ইন্তেকালও করেছেন করাচীতে। তাঁর মাজারও করাচীতেই অবস্থিত। তার উপর করাচীকে রাজধানী তিনিই নির্বাচিত করেছিলেন। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ করাচীতে বসেছিল এবং যতদিন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পাকিস্তানে চালু ছিল, ততদিন করাচীতেই ছিল আমাদের রাজধানী আর এ সম্পর্কে তেমন কোন আপত্তি ওঠে নি কোনদিক থেকেই। সর্বোপরি করাচীর সঙ্গে পাকিস্তানের সব অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ রক্ষা ও স্থাপন অপেক্ষাকৃত সহজ করে তুলেছে সমুদ্র আর বন্দর। রাজধানীর ব্যাপারে মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে যেমন উপেক্ষা করা যায় না, তেমনি যায় না মানুষের সহজগম্যতাকেও। বরং শেষোক্ত বিবেচনা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। মোটামুটি শ'খানেক টাকা খরচ করলে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষও করাচী পৌঁছতে পারে। ১৯৬৩-তে আমার একবার করাচী যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তখন ওখানকার নেতৃস্থানীয় বাঙালীরা আমাকে বলেছিলেন —করাচীতে পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা মোটামুটি শতকরা পাঁচের মতো হবে এখন। তাঁদের বিশ্বাস, রাজধানী স্থানান্তরিত না হলে এতদিনে ওখানে পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা শতকরা দশে গিয়ে দাঁড়াতো। যা-ই হোক, এভাবে করাচীতে নানা কার্য ও জীবিকা উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তানীদের সমাগম হচ্ছিল দিন দিন। হঠাৎ আইয়ুব যদি ঐ কাণ্ড না করে বসতেন, তা হলে অচিরে করাচীতে আর করাচীর জন-জীবনে পূর্ব পাকিস্তানীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার অবস্থায় পৌঁছে যেতো।

করাচীতে যে-হোটেলে আমাদের রাখা হয়েছিল, একদিন দেখলাম সেখানে একজন বিদ্যুৎ-মিস্ত্রী কি একটা মেরামতের কাজ করছে। আমাদের বাংলা সংলাপ শুনে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ি কোথায়? বললে: নোয়াখালী। একটা ঔষধ কিনতে এক ঔষধের দোকানে ঢুকে আবিষ্কার করেছিলাম, ছোকরা সেলসম্যানের বাড়ি ঢাকা। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকুরীতে ঢুকেও পূর্ব পাকিস্তানী স্বল্পশিক্ষিত আর সাধারণ মানুষেরা করাচীতে জীবিকার সংস্থান করে নিতে শুরু করেছিল, যা ইসলামাবাদে আদৌ সম্ভব নয়। এমন কি ইসলামাবাদে গিয়ে পৌঁছানোও সাধারণ স্বল্পবিত্ত মানুষের সাধ্যের বাইরে।

চার

পাকিস্তানের দুই অংশ, দুই অংশই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ দুই অংশের সমন্বয়েই আমাদের গড়ে উঠতে হবে জাতি হিসেবে—আমাদের জাতীয় সংহতিও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এ সমন্বয়ের উপর। দেশের হৃৎপিণ্ড রাজধানী রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনসংখ্যার নাগালের বাইরে থেকে গেলে এ সংহতি কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না। অর্থের চেয়েও জাতি অনেক বড়—অর্থ দিয়ে জাতীয় অস্তিত্ব আর জাতীয় সংহতির মূল্যায়ন হয় না। একনায়কত্বের খেসারত জাতিকে দিতেই হবে—ইসলামাবাদের পেছনে যে-বিপুল অর্থব্যয় তা খেসারত হিসেবে গণ্য করে অচিরে রাজধানীকে করাচীতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত। এটিই হওয়া উচিত এখন অন্যতম প্রধান গণতান্ত্রিক দাবী। এ দাবী স্বীকৃত না হলে পূর্ব পাকিস্তান কিছুতেই কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের অন্য অংশের সঙ্গে সমতা অর্জন করতে পারবে না। শাসনতান্ত্রিক যে-পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না—কেন্দ্রীয় সরকারের সুযোগ-সুবিধে-ক্ষমতা আর প্রভাব চিরকালই বৃহত্তর জনসংখ্যার নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। জনসংখ্যা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের চেয়েও, পূর্ব পাকিস্তানের শুধু নয়, সারা পাকিস্তানের স্বার্থের দিক দিয়ে এটি আমার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের ঐক্যবদ্ধ দাবী তোলা উচিত।

স্রেফ পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের দিক থেকে দেখলেও দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি আইয়ুব সরকারের প্রচণ্ডতম আঘাত হচ্ছে করাচী থেকে

দেশের রাজধানীকে ইসলামাবাদে নিয়ে যাওয়া। ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে: বৃহত্তর জনসংখ্যা-অধ্যুষিত হয়েও কেন্দ্রীয় রাজধানীতে, রাজধানীর জনজীবনে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোথাও পূর্ব পাকিস্তান অনুমাত্র প্রভাবও বিস্তার করতে পারছে না। রাজধানী ওখানে থাকলে এভাবে চিরকালই এ অঞ্চল কোণঠাসা আর অবহেলিত হয়েই থাকবে। ভৌগোলিক কারণে ইচ্ছা করলেও রাষ্ট্রের পক্ষে প্রতিকার করা সম্ভব হবে না।

রাওয়ালপিণ্ডি বা ইসলামাবাদে পূর্ব পাকিস্তানী মন্ত্রীরা অসহায় জীব ছাড়া কিছুই না। তাঁদের নিজ নিজ দফতরেও সংখ্যাসাম্য নীতি প্রয়োগে তাঁরা-যে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন তার কারণ এখানেই নিহিত। বেচারাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই—তাঁরা দফতরে ঢুকেই দেখতে পান তাঁর সেক্রেটারি, তাঁর স্টেনোগ্রাফার, তাঁর সহকারী, তাঁর ব্যক্তিগত পিয়নটি পর্যন্ত কেউই তাঁর সমভাষী নয়, কেউই নয় তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল, বরং তাঁকে দেখেন কিছুটা সন্দেহ আর কৃপার চোখে। ঘর থেকে বের হতেই দরজায় যে-গোঁফ পাকানো বন্দুক কাঁধে ইয়া বিরাট দারোয়ানটিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পান—সেও তাঁর আপন মানুষ নয়। হয়তো অভ্যাসবশত স্যালুট একটা সে দেয় তবুও বুক তাঁর দুরু দুরু করতে থাকে। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠা কি জাহির করা, স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা নিজের পছন্দমতো কাকেও নিয়োগ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। একবার এক জাঁদরেল মন্ত্রীর আত্মীয়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম: এ অবস্থায় মন্ত্রী সাহেব মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন না কেন?

উত্তরে তিনি বলেছিলেন: মন্ত্রী নিজেই নাকি তাঁকে একবার দুঃখ করে বলেছিলেন—ওঁরা আমাদেরে কানে ধরে মন্ত্রিত্বের গদিতে বসিয়েছেন আবার কানে ধরে নামিয়ে না দিলে ওখান থেকে নেমে আসার সাধ্য নেই আমাদের। এই হচ্ছে আমাদের মন্ত্রীদের অবস্থা! মন্ত্রিসভার সংখ্যাসাম্য বৃহত্তর জনসংখ্যা-অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষের জন্য যে এ যাবৎ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হয় নি তার কারণ আশা করি আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হবে না। রাজধানী ইসলামাবাদে থাকলে এ অবস্থাই চলতে থাকবে। পরিবর্তনের সুদূর সম্ভাবনাও নেই। তাই আমি কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচীতে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী। এতে দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যার সংযোগ যেমন সহজতর হবে তেমনি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতিও দেখানো হবে শ্রদ্ধা। রাষ্ট্রীয় সংহতির পথও এতে হবে সুগম।

রাজধানী বনাম জাতীয় সংহতি

এক

এ সম্পর্কে আমি পূর্ববর্তী প্রবন্ধেও লিখেছি কিন্তু বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তা পুনরাবৃত্তির দাবী রাখে। যাঁরা সত্য-সত্যই জাতীয় সংহতি চান এবং জাতীয় সংহতিতে যাঁদের আন্তরিক বিশ্বাস রয়েছে তাঁরা এ সম্বন্ধে কিছুতেই উদাসীন থাকতে পারেন না। এটা কোন দল বা দলীয় সমস্যা নয়—জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে বিচার করে দেখলে এটাকে স্রেফ আঞ্চলিক সমস্যা হিসেবেও যায় না নেওয়া। এটা সামগ্রিকভাবে জাতীয় সমস্যা—কারণ, রাজধানীকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে জাতির সর্বাংশে ঐক্য আর জাতীয় সংহতি। রাজধানী জাতির হৃৎপিণ্ড, জাতির জীবন-স্রোত, দেহের রক্তস্রোতের মতো এখান থেকেই প্রবাহিত হয়ে রাষ্ট্র আর জাতীয় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, সুযোগ পায় ছড়িয়ে পড়ার। দেহের রক্তস্রোত যেন মাথার উপরিভাগ থেকে পায়ের কড়ে আঙুল পর্যন্ত সমানে ছড়িয়ে পড়া চাই, তেমনি রাষ্ট্রের বেলায়ও তা অপরিহার্য—রাষ্ট্র-স্রোতও রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছানো চাই, দেহের কোথাও যদি রক্তস্রোত না পৌঁছে বা বন্ধ হয়ে যায় রক্ত চলাচল, সেখানে যেমন অনিবার্যভাবে দেখা দেয় পঙ্গুতা আর চলনশক্তিহীনতা, তেমনি রাষ্ট্রের ঘটে সে একই দশা। রাষ্ট্র-দেহও অবিকল মানবদেহের মতোই। দেশের হৃৎপিণ্ড রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র কখনও সুসংহতভাবে গড়ে উঠতে পারে না—তেমন রাষ্ট্রে জাতীয় সংহতি স্রেফ আকাশ-কুসুম। এ অবস্থায় জাতি-যে স্রেফ দুর্বল আর পঙ্গু হয়ে পড়ে তা নয়, তখন জাতির বিভিন্ন অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত হয় না কোন রকম ঐক্য-চেতনা, এমনকি তিরোহিত হয় সহযোগিতার সব রকম সম্ভাবনাও। ঐক্যবোধ আর সহযোগিতার অভাবের ফলেই দেখা যায় বিচ্ছিন্নতা। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মানুষে মানুষে যোগাযোগ আর সহযোগিতা ছাড়া—শুধু কথা আর বুলির ফানুস উড়িয়ে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠতে পারে না। স্রেফ ধর্ম যদি জাতীয়তা আর

জাতীয় সংহতির বুনিয়াদ হতে পারতো তাহ'লে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রগুলির দশা কখনো এমন হতো না। ওদের ধর্ম এক, ভাষা এক, সংস্কৃতিও এক—তবুও পরস্পরে মিল হয় না কেন? এমন কি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধেও তারা কেন হতে পারে না কিছুতেই ঐক্যবদ্ধ?

ধর্ম জাতীয়তা আর জাতীয় সংহতির একমাত্র বুনিয়াদ-যে নয়, এ সত্য যুগে যুগে সব দেশেই বার বার প্রমাণিত হয়েছে। আজকের মধ্যপ্রাচ্যেই শুধু নয়, ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানে মুসলমানে রক্তক্ষয়ী লড়াইর এন্তার নজির রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবেরা মুসলিম জগতে তদানীন্তন খলিফা তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল—তারই নতিজা আজকের ইসরাইল। তখন সারা প্যালেস্টাইন ছিল তুরস্কের দখলে। আরবেরা তুরস্কের বিরুদ্ধে না গেলে সে যুদ্ধের পরিণতি হয়তো এমন হতো না। আব্বাসীয় আর উম্মীয়রাও পুরোপুরি মুসলমানই ছিলেন। কিন্তু তাঁরাও কি পরস্পর কম লড়াই করেছেন? মোগল আর পাঠানরাও তো মুসলমান ছিল। তবুও ভারত ইতিহাসে মোগল-পাঠানে যুদ্ধ এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায় হয়ে আছে। দু' দুটো প্রলয়ঙ্করী বিশ্বযুদ্ধের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ তো খৃস্টান ধর্মাবলম্বীই ছিল—লক্ষ লক্ষ স্বধর্মাবলম্বীকে হত্যা করতে কোন পক্ষেরই বিবেকে বাধে নি তখন। স্বার্থের সংঘর্ষ যখন দেখা দেয় তখন ধর্ম আর ধর্মের দোহাই-যে কোন কাজেই লাগে না, তার প্রমাণের কোন অভাব নেই। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীন-জাপানের বেলায়ও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সাধারণ এক শত্রু আরবদের বুকের উপর বসে আছে। দখল করে আছে নিজেদের পবিত্র ধর্মীয় স্থান। এ অবস্থায়ও তো একই ধর্মাবলম্বী সৌদী আরব আর ইয়েমেন রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে আজও। এসব প্রত্যক্ষ দৃশ্য চোখের সামনে দেখেও আমাদের একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ কি করে-যে ধর্মকে জাতীয় সংহতির একমাত্র বুনিয়াদ বলেন, তা বোঝা যায় না। পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব বারো শ' মাইলেরও অধিক—আর পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের দূরত্ব মাত্র কয়েক শ' গজের—ধর্মই যদি জাতীয়তার বুনিয়াদ হয় তা হলে পাকিস্তান আর আফগানিস্তান একজাতি নয় কেন? মানুষের কথা আর কাজে কিছুটা অন্তত লজিক থাকা চাই—আমাদের এসব নেতারা মনে হয় লজিক তথা যুক্তির কোন ধারই ধারেন না। আশ্চর্য, এসব বাস্তব সত্যকে তাঁরা এড়িয়ে

চলেন একদম চোখ বুজে। ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি খুনাখুনি কি কম হয়? উভয়ে শুধু-যে একই মাতা-পিতার সন্তান তা নয়, বিশ্বাসও করে একই আল্লায়, একই রসুলে, একই ধর্মে, এমনকি একই বেহেস্ত-দোজখে। তবুও একজন আর একজনকে খুন করতে দ্বিধা করে না। আসলে ব্যক্তি-জীবনে যেমন, তেমনি জাতীয় জীবনেও চাই ন্যায়-বিচার, হক-পোরস্তি, পারস্পরিক সহযোগ ও সহযোগিতা। জুলুম আর অন্যায়-অবিচার মানুষ বেশীদিন মুখ বুজে সহ্য করে না। এ মানবস্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্যই ভাইও ভাইয়ের মাথা ফাটায়। পৃথক হওয়া তো প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কার্যকারণ সন্ধান করলে দেখা যাবে, এ সবের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের অবিচার আর জুলুম। জাতি আর রাষ্ট্রের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। রাষ্ট্র বা জাতিও মানুষকে নিয়ে, মানুষের সমবায়েই গঠিত। রাষ্ট্র মোটেও কোন জড়বস্তু নয়। তাই যা কিছু মানবিক, রাষ্ট্রীয় জীবনেও তার প্রয়োগ আর অনুসরণ করা না হলে পারিবারিক ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বের যা পরিণতি, রাষ্ট্রীয় জীবনেও সে পরিণতি না ঘটে যায় না।

দুই

কলমের এক খোঁচায় আমাদের কেন্দ্রীয় রাজধানী যে করাচী থেকে সুদূর ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, পাকিস্তানের ইতিহাসে এর চেয়ে অদূর-দর্শিতার দ্বিতীয় নজির খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি আর গোষ্ঠীস্বার্থের এ এক জঘন্যতম নিদর্শন—এ ব্যাপারে দেশ আর দেশের স্বার্থকে সম্পূর্ণভাবেই করা হয়েছে উপেক্ষা। ভুলে থাকা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা-গরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থকে সম্পূর্ণভাবে। ফলে, পাকিস্তানের সব অঞ্চলের মানুষের সংযোগ আর সম্মিলিত সমাজ-জীবন গড়ে তোলার পথে এ হয়ে দাঁড়িয়েছে এক দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়। ইসলামাবাদে রাজধানী রাখা মানে পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানকে চিরকালের জন্য আলাদা করে দেওয়া—পরস্পরকে মেলামেশার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার পথে এর চেয়ে বড় অন্তরায় আর কল্পনা করা যায় না। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর অর্থনৈতিক কারণে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ একমাত্র রাজধানীতেই সম্মিলিত আর

একত্রিত হতে পারে। ইসলামাবাদে তা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই আমার বিশ্বাস, আমাদের সব দফার চেয়েও রাজধানীর দফা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রাজধানী যদি ইসলামাবাদে থেকে যায় তা হলে অন্য দফাগুলি অকেজো হয়ে যাওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে। রাজধানী মানে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের কতকগুলি বিভাগীয় কেন্দ্র নয়—জাতির জাতীয়-জীবন, তার ধ্যান-ধারণা, সংহতি আর ঐক্যবোধ রাজধানীকে কেন্দ্র করেই সাধারণত গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। পাকিস্তানের বৃহত্তর জনসমষ্টি বাস করে পূর্ব পাকিস্তানে—পূর্ব পাকিস্তান থেকে ইসলামাবাদে পৌঁছানোর কোন উপায়ই নেই। যে-উপায় আছে তা শুধু-যে সাধারণের নাগালের বাইরে তা নয়, উচ্চ-মধ্য-বিত্তের আর্থিক ক্ষমতারও তা অতীত। এ অবস্থায় রাজধানীর অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধে থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ চিরকালই বঞ্চিত থাকবে। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে রাজধানীতে সরকারী আর বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে—তাতে নিযুক্ত হবে বহু মানুষ, জীবিকার সংস্থান হবে লক্ষ লক্ষ মানুষের। এসব মানুষের শতকরা একজনও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ হবে না, ইচ্ছা করলেও হতে পারবে না। রাষ্ট্রের সবচেয়ে কর্মচঞ্চল কেন্দ্র রাজধানী, ওখানে গড়ে উঠবে ছোট-বড় অসংখ্য ব্যবসার প্রতিষ্ঠান। সে সব প্রতিষ্ঠানের মালিক বা কর্মচারীর একটা ভগ্নাংশও হবে না পূর্ব পাকিস্তানীরা। সরকার বড় জোর উচ্চ পর্যায়ের চাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে পারে বটে, কিন্তু নীচের দিকের অবস্থা কি হবে? অধিকাংশ মানুষের জীবিকার সংস্থান সেখানেই হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে হাজার হাজার কেরানী কিংবা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, পিয়ন ইত্যাদি নিযুক্ত হবে, তাতে পূর্ব পাকিস্তানীদের যথাযথ স্থান হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? আমাদের যা প্রাপ্য তার দশমাংশও কি আমাদের ভাগ্যে জুটবে এ অবস্থায়? অথচ এদের মাইনে, এদের খরচ পূর্ব পাকিস্তানীদেরও সমানে বহন করতে হবে। রাজধানীতে যে-অসংখ্য চাকুরী আর জীবিকার বিভিন্ন পথ খুলে যাবে তার ষোল আনা সুযোগ পশ্চিম পাকিস্তানীরাই শুধু পারবে গ্রহণ করতে; ফলে সেখানে বেকারত্ব কমে যাবে অনেকখানি। আর পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থা দাঁড়াবে সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সত্যটা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা যত শিগগির বুঝতে পারবেন ততই জাতির মঙ্গল। জীবিকার সুযোগ-সুবিধে থেকে যদি রাষ্ট্রের একটা অঞ্চল বঞ্চিত

থাকে আর রাষ্ট্র-দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যদি সব অঞ্চলের সম-উপস্থিতি অনুভূত না হয় তা হলে জাতীয় সংহতি তো ক্ষুণ্ণ হবেই; সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটা প্রবল অসন্তোষও উঠবে ধূমায়িত হয়ে—যার পরিণাম কখনো রাষ্ট্রের জন্য শুভ হতে পারে না। তদুপরি, ইসলামাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের পেছনে জাতির সম্মতি বা সমর্থন ছিল না কোন কালেই—সে সমর্থন চাওয়াও হয় নি কখনো। ওটা সম্পূর্ণভাবে আইয়ুবীয় সামরিক শাসনের সিদ্ধান্ত। আমার বিশ্বাস, আইয়ুব শাসনের সবচেয়ে বড় কুকীর্তি এটিই। জাতীয় সংহতির মূলে এর চেয়ে বড় কুঠারাঘাত আর হতে পারে না। দেশের জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ থেকে রাজধানীর সব রকম সুযোগ-সুবিধে ছিনিয়ে নেওয়ার মতো বড় অবিচার কল্পনা করা যায় না। এত বড় অবিচার পূর্ব পাকিস্তান কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা আর রাজনৈতিক দলগুলি যদি সত্যি সত্যি জাতীয় সংহতি কামনা করেন, তাঁদেরও উচিত রাজধানীকে সব অঞ্চলের মানুষের নাগালের মধ্যে ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে শরিক হওয়া। কারণ, এছাড়া জাতীয় সংহতি কিছুতেই অর্জিত হতে পারে না—বরং সব ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের ব্যবধান আরো বেড়ে যাবে। ব্যবধান বেড়ে যাওয়ারই এক নাম বিচ্ছিন্নতা।

যাঁরা কেন্দ্রীয় রাজধানীর প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসা হয়ে গেছে বলে দাবী করছেন তাঁরা-যে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের শত্রুতা করছেন তা নয়, তাঁরা গোটা পাকিস্তানের তথা সামগ্রিকভাবে জাতীয় সংহতিরই ক্ষতি করেছেন। কারণ, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মানুষকে তাঁরা চিরকালের জন্যই পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন—মিলনের একটা সার্বজনীন ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত করেছেন জাতিকে। সংখ্যাগরিষ্ঠের বাসস্থান হিসেবে কেন্দ্রীয় রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানেই হওয়া উচিত, কিন্তু দুই কারণে আপস ফরমুলা হিসেবে আমি রাজধানী করাচীতে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী: প্রথমত যাঁকে আমরা জাতির জনক আর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বলি তিনি নিজে করাচীকে পাকিস্তানের রাজধানী নির্বাচন করেছিলেন আর করাচী তাঁর জন্মস্থান যেমন, তেমনি মৃত্যু-স্থানও এবং তাঁর মাজারও ওখানে। জাতীয় ব্যাপারে আবেগের একটা বিশেষ মূল্য আছে বই কি। রাষ্ট্রের সর্ব অঞ্চলের মানুষ এ কারণে করাচী সম্বন্ধে যে-আবেগ অনুভব করবে, ইসলামাবাদ বা অন্য কোন স্থান সম্বন্ধেই তেমন আবেগ অনুভব করার

কথা নয়। দ্বিতীয়ত এবং সেটাই সবচেয়ে বড় কথা, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের মানুষও সাধারণ কিছু খরচ করে করাচী পৌঁছতে পারে এবং সেখানকার আর্থিক আর সামাজিক জীবনে তারাও নিতে পারবে অংশ। এভাবে ওখানে গড়ে উঠতে পারবে পাকিস্তানের সব অঞ্চলের মানুষের মিলিত এক সমাজ, যা হবে জাতীয় সংহতির এক সুদৃঢ় বুনিয়াদ।

ধর্ম-ভিত্তিক বনাম ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা-প্রসঙ্গে

এক

ধর্ম কথাটার মধ্যে একটা অসম্ভব মোহ রয়েছে। ফলে যে-কোন কিছুর সঙ্গে ধর্মকে তথা ধর্ম শব্দটাকে যখন জুড়ে দেওয়া হয় তখন তা হয়ে পড়ে স্রেফ আবেগের বিষয়। কোন রকম যুক্তি-বিবেচনা তাতে আর ঠাঁই পায় না। এমনকি বুদ্ধি কিংবা যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখার সাহসটুকুও যেন মানুষ তখন হারিয়ে বসে। কেউ কেউ তা করাকে মনে করে রীতিমতো বড় রকমের এক গুনাহ্! যারা আরো এক ডিগ্রি বেশী গোঁড়া তারা মনে করে স্রেফ নাস্তিকতা। বলা বাহুল্য তারাই গোঁড়া, যারা বিচার-বিমুখ আর পরিচালিত হয় অন্ধ আবেগে। সামাজিক জীবনে এসব মানুষ অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ স্বভাবে এরা হয়ে থাকে চরম অসহিষ্ণু। ধর্মে পরমত-সহিষ্ণুতার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা-সত্ত্বেও এরা ধর্মের নামেই অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে থাকে সবচেয়ে বেশী। পরমত-সহিষ্ণুতা শুধু-যে সত্যিকারের ধর্ম-জীবনের লক্ষণ তা নয়, সভ্য-জীবনেরও এক প্রধান শর্ত, সমাজ-জীবনেরও বুনিয়াদ। এছাড়া সমাজ-জীবন দু'দিনেই মগের মুল্লুক না হয়ে যায় না।

আমাদের মতো অনুন্নত দেশে ধর্মের বুলি, ধর্মের ভেক আর বাহ্যিক ধার্মিকতার একটা জনপ্রিয়, লোক-ভুলানো আবেদন রয়েছে। তাই মানুষ সহজে এর খপ্পরে না পড়ে পারে না, এ কারণে কোন কোন রাজনৈতিক দলের এ হয়ে পড়েছে এক মোক্ষম অস্ত্র। ফলে ধর্ম এখন এদের হাতে সব রকম আধ্যাত্মিক আবেদন হারিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনীতি তথা রাজনৈতিক হাতিয়ার।

সম্প্রতি আমাদের দেশে ধর্ম-ভিত্তিক বনাম ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা-সম্বন্ধে একচোট উত্তেজক আলোচনা হয়ে গেছে। এ আলোচনা ভবিষ্যতে আরো-যে অধিকতর উত্তেজক হয়ে উঠবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ, আমরা নাকি 'অতি বেশী ধর্মপ্রাণ জাতি! খাঁটি অর্থে আমরা কতখানি ধর্ম-প্রাণ তা সঠিকভাবে

বলার উপায় নেই, তবে ধর্মের নামে আমরা-যে প্রাণ দিতে আর নিতে জানি তার দেদার নজির আমাদের ইতিহাসে রয়েছে। আজো সমাপ্তি ঘটে নি সে ইতিহাসের।

কিন্তু যদি জিজ্ঞেসা করা যায় ধর্মের নামে এই যে আমরা প্রাণ দেওয়া-নেওয়া করেছি, সে কার সঙ্গে? কোন বিধর্মীর সঙ্গে কি? ইতিহাস বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের সঙ্গেই। একদল মুসলমানের সঙ্গেই। উপরে শিক্ষা নিয়ে যে-উত্তেজক আলোচনার কথা বলেছি তাতেও সীমিতভাবে প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঘটেছে এবং ঘটেছে নিজেদের মধ্যেই। যে-ধর্মের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ভ্রাতৃত্ব-প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের হাতে সে ধর্ম হয়ে পড়েছে এখন ভ্রাতৃহননের হাতিয়ার! আশ্চর্য, আমাদের তথাকথিত ধর্ম-প্রাণ মুসলমানেরা কিন্তু একবারও ভেবে কিংবা বিচার করে দেখে না যে, এতে কার কতটুকু ফায়দা হয়েছে। নিজের ধর্মের, নিজের দেশের, নিজের সমাজের, এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়েও কোন লাভ হয়েছে কি কারো?

বলেছি তথাকথিত ধর্ম-প্রাণরা স্বভাবতই বিচার-বিমুখ হয়ে থাকে। এসব সে বিচারমুখীনতারই শোচনীয় পরিণতি। না হয় সেই খোলাফা-এ রাশেদীনের আমল থেকে ধর্মের নামে যে-ভ্রাতৃ-হনন শুরু হয়েছে ইতিহাসের বিচিত্র-পর্বে যা খারেজি-শিয়া-সুন্নী-ওহাবী-কাদিয়ানী-ফরায়েজী-লা-মজহাবী ইত্যাদি নানা নামে চিহ্নিত হয়ে বর্তমানে আমাদের দেশে ধর্ম-ভিত্তিক বনাম ধর্ম-নিরপেক্ষতার বহছে এসে ঠেকেছে, তাতে একবিন্দু ফায়দাও আমি লক্ষ করি নি কোথাও! বরং লক্ষ করেছি এতে ইসলামের নাম হয়েছে কলঙ্কিত, মুসলমান হয়েছে দুর্বল, দ্বিধা-বিভক্ত আর খণ্ডিত আর ধর্মের আসল উদ্দেশ্য হয়েছে পদে পদে ব্যর্থ।

আমার ধারণা, ধর্ম এক অতি সহজ, সরল ব্যাপার, তাতে কোন রকম হেঁয়ালি কিংবা জটিলতার স্থান নেই। কতকগুলি অতি সোজা, অতি সুস্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য বিশ্বাস পোষণ আর তার আনুষঙ্গিক ধর্মীয় নির্দেশ, যেমন নামাজ, রোজা, হজ, জকাৎ ইত্যাদি পালনের মধ্যেই ধর্ম-জীবন সীমিত। এসব কোন অর্থেই জটিল কিংবা দুর্বোধ নয়। এসবে মতভেদের তেমন অবসর আছে বলেও আমার মনে হয় না। ছেলেমেয়ে আর পোষ্যদের এসব শিক্ষা দেওয়া মুসলমান পরিবারের এক চিরকেলে রেওয়াজ। এখন সে রেওয়াজ যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়ে থাকে তার জন্য আধুনিক জীবন-সমস্যাই দায়ী

—যে-জীবনকে অস্বীকার করা এখন কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, এ জীবন তথা আধুনিক জীবনের বেশীর ভাগই জুড়ে আছে ধর্ম-নিরপেক্ষতা। ধর্ম-নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দেওয়া সোজা, কিন্তু ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার ফল প্রত্যাখ্যান করা কারো পক্ষেই আজ সম্ভব নয়। এ কারণে দেখা যায়, জন-মানসকে বিভ্রান্ত করার জন্য মুখে যারা অহরহ ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার জিকির করে থাকেন ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনের সময় তাঁরাও ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা-জাত ফল-গ্রহণে এতটুকু অরুচির পরিচয় দেন না। অত্যন্ত সোৎসাহে বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া এমন ধর্ম-প্রাণরাও ভোগ করে থাকেন। অথচ তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন ঐ বস্তুটা মোটেও ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার ফল নয়। ওর সবটাই সম্পূর্ণভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষারই ফলশ্রুতি। বাস্তব-জীবনে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার নানা ফল ভোগ করা আর স্রেফ লোক ভুলানোর জন্য মুখে ঐ শিক্ষার বিরোধিতা করাকে ঠিক সাধু আচরণ বলা যায় না। এর নাম মানসিক সততা নয়।

আমাদের যে-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার দাবীতে অতিমাত্রায় সোচ্চার, কিছুদিন আগে সে প্রতিষ্ঠানের আমীরে আজম চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার অন্যতম প্রাণ-কেন্দ্র লণ্ডনে। লণ্ডনে তাঁর অপারেশন করেছেন ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তারেরাই, সেবা করেছেন ঐ শিক্ষায় শিক্ষিতা নার্সরাই। অধিকন্তু ঐ নার্সরা-যে বেপর্দায় চলে তাও সকলের জানা কথা। ঐ সব ডাক্তার আর নার্সরা-যে নিষিদ্ধ তথা হারাম খাদ্য আর পানীয়ও খেয়ে থাকে তাতেও বোধ করি সন্দেহ নেই। তবুও ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার এমন জেহাদী দাবীদারেরাও চিকিৎসার জন্য সেখানে গেলেন কেন? যান এ কারণে যে, তাঁরাও মনে মনে জানেন—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মুখে যাই বলা হোক না কেন, ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা তথা সে শিক্ষা-জাত ফল গ্রহণ না করে তাঁদেরও নিস্তার নেই। এসব রাজনৈতিক আলেমরা যদি 'জান বাঁচানো ফরজ' এ ফতোয়ার দোহাই দিয়ে সেকুল্যারিজমের ফল গ্রহণকে জায়েজ মনে করেন, তা হলে তাঁদের 'জেহাদী' সংকল্পের চেহারাটাই তো অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে! জেহাদী সঙ্কল্পের অর্থ তো 'প্রাণ যায় যাক'। প্রাণের মায়ায় যদি সেকুল্যারিজমের তথা ধর্ম-নিরপেক্ষ বিদ্যার আশ্রয় নিতেই হয় তা হলে ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার চেয়ে সেকুল্যার তথা ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা-যে উৎকৃষ্টতর

তা কি স্বীকার করে নেওয়া হয় না ? ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার দাবী যাঁরা করেন তাঁদেরও তো এ দাবী। আসলে ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার দাবীদারেরা ধর্ম-নিরপেক্ষতার বাসন থেকে গ্রাসটা তুলে হাতটাকে মাথার চারদিকে লণ্ডন-প্যারি ঘুরিয়ে এনে মুখে পুরছেন মাত্র, আর ধর্ম-নিরপেক্ষবাদীরা গ্রাসটা বাসন থেকে তুলে সরাসরি দিচ্ছেন মুখে। তফাতটা শুধু এখানে। না হয় এ রকম বহু নজির দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে, ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার দাবীদারেরা ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাকে বাদ দিয়ে এ-জীবনে এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবেন না এবং পারছেনও না। ধর্ম-নিরপেক্ষতা মানে ইহলোকে বেঁচে থাকা, জীবনের বিকাশ সাধন করা, যে-যুগে, যে-দেশে জন্মগ্রহণ করা গেছে-সে-যুগ আর সে-দেশের চাহিদা, প্রয়োজন আর সমস্যার মোকাবেলা করে বেঁচে থাকা। স্রেফ ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার দ্বারা এ হওয়ার নয়। হলে নেজামে ইসলামের সম্পাদক নিজের ছেলেকে ক্যাডেট কলেজে না পাঠিয়ে পাঠাতেন মাদ্রাসা আলিয়ায়। অক্সফোর্ড কেমব্রিজের পরিবেশ আর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা সর্বতোভাবেই সেকুল্যার তবুও ঐখানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেলে আমাদের মৌলবী মওলানাদের ছেলে-জামাইও দেখেছি কৃতার্থ বোধ করেন, এমনকি ঐসব ছেলে-জামাইএর বাপ-শ্বশুররাও মনে করেন যেন হাতে চাঁদ পাওয়া গেল। এমনতর উৎসাহ নিয়ে এঁরা কখনো নিজের ছেলে কি জামাইকে শিক্ষার জন্য মক্কা-মদিনা কিংবা বাগদাদ-দামেস্ক বা মিসরে পাঠান না। দেশের উচ্চ মাদ্রাসাগুলিতেও কি পাঠান ? ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা যদি ভালো হয় তা ষোল আনাই ভালো একথা না মেনে উপায় নেই। সে ষোল আনা ভালো শিক্ষা আমাদের মক্তব-মাদ্রাসাগুলিতে আবহমানকাল ধরেই চলছে। কিন্তু সে শিক্ষায় শিক্ষিতদের আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের কোথাও কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় কি ? দেশের প্রশাসন-ক্ষেত্রে কোথাও তো তাঁদের স্থান নেই, দেশ-রক্ষায় তাঁরা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, আজাদী আন্দোলনেও তাঁদের ভূমিকা ছিল অকিঞ্চিৎকর। মোটকথা, আধুনিক রাষ্ট্রীয় দাবী আর জীবনের মোকাবেলায় তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত। বৃহত্তর সমাজেরও-যে এ সত্য জানা নেই তা নয়, জানা আছে বলেই দেশের সেকুল্যার শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে যেমন ভর্তির ভিড় দেখা যায় ঐসব অ-সেকুল্যার শিক্ষালয়ে তার সিকি পরিমাণ ভিড়ও দেখা যায় না। আজ শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা সেকুল্যার বিদ্যালয়

আর সেকুল্যার বিষয়ে ভর্তির সমস্যাই। প্রতি বছর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ঐসব বিদ্যাকেন্দ্রে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে লেখাপড়াই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। চিকিৎসা আর প্রকৌশল ক্ষেত্রে অবস্থা আরো জটিল। অন্য দিকে ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা-কেন্দ্র মাদ্রাসাগুলিতে অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে কোন ছাত্র ভর্তির সুযোগ পায় না তেমন কথা আজো শোনা যায় নি।

দুই

আমাদের দেশে ধর্ম বা ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগের কোন অভাব আছে বলেও মনে হয় না। মক্তব মাদ্রাসার কথা বাদ দিলেও নিউ স্কীম মাদ্রাসাগুলি রয়েছে, যেখানে ইংরেজী, বাংলা, অঙ্কের সাথে সাথে প্রচুর ধর্মশিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। তবুও শোনা যায় সে-সব মাদ্রাসায়ও এখন ছাত্রসংখ্যা দিন দিনই কমে এসেছে। যে-কোন ধরনের মাদ্রাসা আর সেকুল্যার হাই স্কুলের আর ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সঙ্গে সেকুল্যার ইন্টারমিডিয়েট কলেজের তুলনা করে দেখলে এ সত্যটাই প্রকট হয় যে, দেশে ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার তেমন কোন চাহিদা নেই। আমাদের প্রায় সব কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম তথা ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তার জন্য আলাদা বিভাগ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সেকুল্যার বিভাগের সঙ্গে তুলনা করে দেখলেও দেখা যায়, ঐসব বিভাগে ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে কম।

সম্প্রতি ছাত্র ভর্তির প্রবল চাহিদা আর চাপ এড়াতে না পেরে বাধ্য হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগে সীটের সংখ্যা কিছু কিছু বাড়িয়েছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিতে যে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

বিষয়	সীটের সাবেক সংখ্যা	এখন বাড়িয়ে যা করা হয়েছে
ইংরেজী	৭৫	৯০
বাংলা	১০০	১২০
অর্থনীতি	১৫০	১৬০
ইতিহাস	৭৫	৮৫
সমাজবিজ্ঞান	৭৫	৯০
দর্শন	৬০	৮০

	সীটের সাবেক সংখ্যা	এখন বাড়িয়ে যা করা হয়েছে
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১৫০	১৮০
বাণিজ্য	১৫০	১৭০
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	২৫	৪০
মনস্তত্ব	৪০	৪৫
ইসলামের ইতিহাস আর সংস্কৃতি	৪০	৬০
আরবী	১৫	২০
ইসলামিক স্টাডিস	২৫	৩০

এসব বিষয়ে সীটের মোট সংখ্যা ছিল আগে ৮১৫, এখন বেড়ে তা হয়েছে ১১৭০। 'ইসলামের ইতিহাস আর সংস্কৃতি'কে ঠিক ধর্ম-ভিত্তিক বিষয় বলা যায় না, বরং সার্বিক ইতিহাসের অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য শাখা এটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ের অধ্যাপক একজন হিন্দু। কাজেই আরবী আর ইসলামিক স্টাডিসকেই শুধু ধর্ম-ভিত্তিক বিদ্যা বলা চলে। এ দুই বিষয়ে সীটের সংখ্যাল্পতা কি প্রমাণ করে না যে, দেশে ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার তেমন চাহিদা নেই? থাকলে এ দুই বিষয়ের এমন শোচনীয় দশা ঘটতো না। শোনা যায়, এসব সীটের জন্যও তেমন কোন প্রতিযোগিতা হয় না। অন্যদিকে ধর্ম-নিরপেক্ষ বিষয়গুলিতে ভর্তির জন্য কিরকম প্রতিযোগিতা ঘটে, তা কারো অজানা নয়। স্থান আর প্রয়োজনীয়-সংখ্যক অধ্যাপকের অভাবে প্রবল দাবী থাকা-সত্ত্বেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে সীট বাড়ানো সম্ভব হয় নি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে। বিজ্ঞান শুধু-যে ধর্ম-নিরপেক্ষ তা নয়, বিজ্ঞানের বহু থিওরি আর মতবাদের সঙ্গেও ধর্মের রীতিমতো বিরোধ রয়েছে। তবুও ধর্ম বা ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার চেয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার চাহিদা দেশে অনেক বেশী। প্রতি বছর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বহু ছাত্র-যে স্রেফ সীটের অভাবে ভর্তির সুযোগ পায় না, এ এক সার্বজনীন সত্য। দেশের ক্ষেত্রে এই তো বাস্তব অবস্থা। এ অবস্থায় ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার ধুয়া তুলে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত আর পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়ার কোন মানে হয় কি? আশ্চর্য, চোখের সামনে সারা মধ্যপ্রাচ্যের শোচনীয় আর করুণ দশা দেখেও আমাদের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের চোখ খোলে না। একবারও এঁরা তাকিয়ে দেখেন না বাস্তবের কঠিন মাটির দিকে, যে-মাটিতে তাঁরা পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ-যে একবার

বলেছিলেন: "ধর্ম-মোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভাল", মনে হয় কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। ধর্মান্ধতার চেয়ে বড় অন্ধতা আর নেই। চোখের অন্ধতা শুধুমাত্র দৃষ্টিশক্তিই হরণ করে, কিন্তু ধর্মান্ধতা হরণ করে বুদ্ধি-যুক্তি-বিচার বিবেক আর সব রকম মূল্যবোধ।

আরবদের মাতৃভাষা আরবী-কোরান-হাদিস, ফেকা-উসুল-তফসীর ইত্যাদি যা কিছুকে এক কথায় ইসলামী ধর্ম-বিদ্যা বলা হয় তা সবই আরবীতে। শিক্ষা-জীবনের শুরু থেকেই আরবেরা এসবের সঙ্গে পরিচিত (এ সবকে বাদ দিয়ে ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা আর কাকে বলা হয় আমার জানা নেই), তবুও শ্রেষ্ঠ ধার্মিকের আদর্শ কি এ যুগের আরবেরা? তা যদি হতো আমার বিশ্বাস তাদের অবস্থা কখনো এমন শোচনীয় হতো না। ক্ষুদ্র এক শক্তির হাতে তারা-যে শুধু পদে পদে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে তা নয় তাদের জীবন-মানও এখন সর্বনিম্নস্তরে। এত নিম্নে যে, ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার দাবীদারেরাও দৈহিক আরোগ্যের জন্য যেমন তাদের কাছে যায় না, তেমনি পাঠায় না নিজেদের ছেলেমেয়েকে মানসিক সম্পদ তথা জ্ঞান আহরণের জন্যও ঐসব দেশে। ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার অভাবেই কি এ পরিণতি? মনে হয় না। বরং আধুনিক শিক্ষা আর সেই শিক্ষাজাত দৃষ্টিভঙ্গির অভাবেরই এ ফল। কোন ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষাই এ অধঃপতিত অবস্থা থেকে ওদের উদ্ধার করতে পারবে না। উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় মনেপ্রাণে আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে সর্বতোভাবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আর যন্ত্রবিদ্যাকে আয়ত্ত করা, পরমুখাপেক্ষিতা ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা। এ করা হলে আমার বিশ্বাস, দশ কোটি মানুষ পৃথিবীতে আবারও অসাধ্য সাধন করতে পারে। তাদের চোখের সামনে ক্ষুদ্র ইসরাইল তার এক জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। জ্ঞানী শত্রুর কাছ থেকেও সব নিয়ে থাকে। আরবদেরও তা নেওয়া উচিত। ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার কোন অভাব আরব দেশে নেই, ছিলও না ইসলামের আবির্ভাবের কাল থেকে। জামে আজহার নাকি প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় আর ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষাই-যে ওখানে দেওয়া হয়, তাতেও বোধ করি সন্দেহ নেই। তবুও সে-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেমন কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন না। আরবদের এখন একমাত্র অভাব ধর্ম-নিরপেক্ষ তথা সেকুল্যার শিক্ষার। আমাদের দেশেও ধর্ম বা ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগের কিছুমাত্র অভাব নেই। অসংখ্য মক্তব-মাদ্রাসা দেশের

আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে, যাতে ধর্মীয় শিক্ষার দরাজ ব্যবস্থা রয়েছে। তদুপরি আমাদের প্রায় সব কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ধর্ম-ভিত্তিক তথা সব রকম ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। যাঁরা ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার দাবীর সমর্থনে জান দেওয়া-নেওয়ার হুমকি দিয়ে থাকেন, তাঁরাও কি এসব সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে থাকেন? করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সীট তথা ছাত্র পরিসংখ্যান এমন বিপরীত তথ্য পরিবেশন করতো না।

তিন

ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা যাঁরা চান তাঁদের কথা আর কাজে স্ববিরোধিতা দেখেই সবচেয়ে বেশী অবাক হতে হয়। আমার এক অধ্যাপক বন্ধুকে—যিনি নিজে ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা পেয়েছেন এবং ধর্মীয় বিষয়েই সারাজীবন অধ্যাপনা করেছেন, একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : একজন বেনামাজী, ধর্মকর্মে সম্পূর্ণ উদাসীন এমন সি. এস. পি. যদি তোমার মেয়ের পাণিপ্রার্থী হয় তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে, না একজন নামাজী-কালামী পরহেজগার আলেম প্রার্থীর সঙ্গে দেবে? বন্ধুবর ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার দাবীদার, তাই তাঁকে এমনতরো প্রশ্ন করা। শুনে অবাক হলাম তিনি বিনা দ্বিধায় মুহূর্তে বলে ফেল্লেন, 'সি. এস. পি'র. সঙ্গেই দেবো'। তিনি তাঁর এক ছেলেকে পড়িয়েছেন অর্থনীতি, অন্য ছেলেকে বাণিজ্য, এক মেয়েকে বাংলা, অন্য মেয়েকে ইংরেজী। কোন ছেলেমেয়েকেই ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা দেন নি, তেমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠান নি। মনে হয় এঁরা যে-ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা চান সে শুধু পরের ছেলের জন্যই, নিজের ছেলেমেয়ের জন্য নয়। যে-শিক্ষাপদ্ধতি এঁরা নিজের ছেলেমেয়ের জন্য অকেজো আর অনাবশ্যক মনে করেন সে শিক্ষা-পদ্ধতি এঁরা দাবী করেছেন পরের ছেলেমেয়ের জন্য। আমার আপত্তি আর প্রতিবাদ এঁদের এ-স্ববিরোধিতার প্রতিই, না হয় বিলাতে নসারাদের মুলুকে অপারেশনের জন্য যাওয়া বা ক্যাডেট কলেজে ছেলেকে ভর্তি করানো কিংবা অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতির মতো ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় অধ্যয়নে আমার কোন আপত্তি তো নেইই বরং আন্তরিক সমর্থন আছে। এমনকি আমার স্পষ্টবাদী অধ্যাপক বন্ধুটির সিদ্ধান্তকেও আমি স্বাগত জানাই।

(বিশেষতঃ এ-কারণে যে, গলার সব জোর দিয়ে ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার দাবী করলেও তিনিও এ-বাস্তব সত্যটুকু ভালো করেই জানেন যে, পরহেজগার আলেমের সাথে মেয়ের বিয়ে হলে মেয়েটি সারা জীবন একটিবার সিনেমা দেখার সুযোগও পাবে না। আর সি. এস. পি.'র সঙ্গে বিয়ে হলে ইচ্ছা করলে বক্সে বসে বিনা পয়সায় রোজই তা দেখতে পারবে।) মোটকথা, মেয়ে-জামাইএর পরকাল-সম্বন্ধে তাঁর কোন দুশ্চিন্তা নেই, তাঁর চিন্তা ওদের ইহজীবনের সুখ-সুবিধা নিয়েই। বলা বাহুল্য ইহজীবনের সুখ-সুবিধারই তো এক নাম ধর্ম-নিরপেক্ষতা বা সেকুল্যারিজম।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা মানে ধর্মহীন শিক্ষা নয়। তা হলে সেকুল্যার দেশগুলিতে এত সব মহাপ্রাণ ধার্মিকের আবির্ভাব ঘটতো না। মানব-কল্যাণে উৎসর্গিত-প্রাণ যত মানুষ ঐসব দেশে দেখা যায় আমাদের মতো ধর্ম-প্রাণ জাতিতে তার সিকি পরিমাণও তো দেখা যায় না। সেকুল্যার দেশেও ধর্ম আছে, ধর্ম-শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান পালিত হয়। ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদের একমাত্র দাবী তো ধর্ম-শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে না আনার। ধর্ম-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি চালু থাক, তার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তর পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ যেমন আছে তা অব্যাহত থাক তাতে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার পক্ষপাতীদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতায়। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই ধর্ম-শিক্ষাকে সব উন্নত দেশেই পারিবারিক আর বে-সরকারী আয়ত্তে রাখা হয়। কারণ, ধর্ম আর রাষ্ট্রের ভূমিকায় যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য স্বীকার না করলে ধর্মই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশী। ধর্মের প্রধান কাজ মানুষকে পরলোকের অনন্ত জীবনের জন্য তৈরি করা। সে-পথের হদিস বাৎলানো। বলা বাহুল্য, পরলোকে বিশ্বাস না থাকলে ধর্মের আবেদন মুহূর্তে নিঃশেষিত। রাষ্ট্র সর্বতোভাবে ইহলৌকিক ব্যাপার। ইহলোকে মানুষের যে-সীমিত জীবন, সে-জীবনের প্রয়োজন মেটানো আর তার দায়িত্ব গ্রহণ আর পালনই রাষ্ট্রের প্রথম আর প্রধান কর্তব্য। মানুষের পারলৌকিক জীবনের ভার গ্রহণ কিংবা মানুষকে ধার্মিক বানানো কোন অর্থেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়, বরং তা করতে গেলে ধর্মের সমূহ ক্ষতি না হয়ে যায় না। ধর্মীয় ব্যাপারে (ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষাও এর অন্তর্গত) রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ মানে রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপ। আমার বিশ্বাস, কোন প্রকৃত

ধার্মিকই তা কাম্য মনে করতে পারে না। রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র পরিচালকরা সব সময় রাষ্ট্রের এবং নিজেদের ইহলৌকিক স্বার্থের দিকে নজর রেখেই রাষ্ট্রীয় সব কিছু, শিক্ষা তো বটেই, পরিচালনা আর নিয়ন্ত্রণ যে করবে এবং করতে চাইবে এ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। সব দেশেই এ ঘটে, ঘটে চলেছে। এ কারণে অনেক সময় খাঁটি ধার্মিক আর শাস্ত্র পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্র পরিচালক হতে চান না—এমন কি কেউ কেউ প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতেও-যে অস্বীকার করেছেন তেমন নজির ইসলামের ইতিহাসেও বিরল নয়।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে-শিক্ষা-ব্যবস্থা তার প্রধান লক্ষ্যই থাকে উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা, যে-নাগরিক পারবে যথাযথ যোগ্যতার সাথে রাষ্ট্রের সব রকম দায়িত্ব গ্রহণ আর পালন করতে। ধর্মীয় ব্যাপার সে দায়িত্বের আওতায় পড়ে না—সে দায়িত্ব পরিবার আর বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান আর সংস্থার। ধর্ম মানুষের সর্বাপেক্ষা পবিত্রতম আর সর্বাপেক্ষা স্বাধীন এলাকা। রাষ্ট্রের বিশেষ করে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রবণতাই হলো সব ব্যাপারে নাক গলানো, মানুষের সব কিছুতেই হস্তক্ষেপ করা। ধর্মীয় ব্যাপারেও যদি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ঘটে তা হলে ধর্মের পবিত্রতা আর স্বাধীনতা দুই-ই খর্বিত আর লঙ্ঘিত হবে। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই ধার্মিক তৈরির উদ্দেশ্যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়ন করে না—করতে চাইলেও ফল সম্পূর্ণ বিপরীতই হবে। কারণ, রাষ্ট্র নিজের স্বার্থেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, চালাবে, প্রয়োজনমতো দোমড়াবে চোমড়াবে। ধর্মের ঋজু-সারল্য তখন আর থাকবে না, হয়ে পড়বে তা রাজনৈতিক দাবা খেলার গুঁটি।

তখন পরলোকমুখীনতা ছেড়ে ধর্মও হয়ে উঠবে ইহলোকমুখী আর ইহলোক-মুখীনতা মানে সেকুল্যারিজম। এখন আমাদের ধর্ম-ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গুলির যে দশা হয়েছে তখন ধর্ম-শিক্ষারও সে একই দশা হবে। জমাআতে ইসলাম বা নেজামে ইসলাম এখন ধর্মের কথা যত না বলে তার চেয়ে অন্তত শতগুণ বেশী বলে নির্বাচনের কথা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের কথা। ওদের সর্বশক্তি এখন সেদিকেই নিয়োজিত। ধর্ম-ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের হাতে ধর্মের এ দুর্দশা না হয়ে যায় না। এ অবস্থায় ধর্মের যে-আসল উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লায় নিবেদিত-প্রাণ করে তোলা, সে ভূমিকা তখন আর থাকবে না। ধর্মকে তখন ইচ্ছামতো রাজনৈতিক তথা দুনিয়াভী উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হবে। তাই

ধর্মের নামে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান করার আমি ঘোর বিরোধী—এমনকি মসজিদে, মিলাদে, ঈদের জমাআতে আর যে-কোন ধর্মসভায়ও রাজনৈতিক আলোচনা কিংবা রাজনীতি নিয়ে আসারও আমি পক্ষপাতী নই।

ধর্মের একটা শাশ্বত ভূমিকা আছে। পারলৌকিক জীবনের প্রস্তুতি ছাড়াও মানুষের আত্মার বিকাশসাধনও ধর্মের উদ্দেশ্য আর ভূমিকা। রাষ্ট্রের এলাকা এসবের বাইরে। পরলোক আর আত্মা নিয়ে রাষ্ট্র মাথা ঘামায় না। ঘামাতে গেলেই রাষ্ট্র আর ধর্ম দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অধিকন্তু তখন ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধ নির্ঘাত আর একটা কারবালা ঘটাবে। ঐতিহাসিকদের অজানা নয় আগের কারবালাটাও ঘটেছিল ধর্ম আর রাষ্ট্রশক্তির বিরোধের ফলেই। ধর্ম সনাতন, চিরন্তন আর অচল, রাষ্ট্র সচল, ক্রম-পরিবর্তনশীল তাবৎ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় রাষ্ট্রকে। এছাড়া আজকের দিনে রাষ্ট্রের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব। এ কারণেই 'ইসলামী' নাম শিরে বহন করেও পাকিস্তানকে একদিকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য দিকে কাট্টা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সাথে দোস্তি করে চলতে হচ্ছে।

ধর্ম আর রাষ্ট্রের ভূমিকা-যে সম্পূর্ণ আলাদা একথা উপরেও একবার উল্লেখ করেছি। এ সত্যটা অনেক সময় ভুলে থাকা হয় বলে এ দুইকে মিলিয়ে এক বিভ্রান্তিকর অবস্থা ডেকে আনা হয় আমাদের দেশে। ধর্ম-ভিত্তিক বনাম ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা নিয়ে যে-বিতর্ক, তাও এ বিভ্রান্তিরই নতিজা। ধর্ম যদি মানুষের মনে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার আর পারলৌকিক জীবনের নির্দেশকের ভূমিকা ছেড়ে রাষ্ট্রের মতো এক স্থূল জাগতিক তথা সেকুল্যার বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে আর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নেয় তা হলে ধর্ম স্বধর্মচ্যুত না হয়ে পারে না। সে সঙ্গে রাষ্ট্রও হবে ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, রাষ্ট্র তখন তার চলিষ্ণুতা হারাতে বাধ্য হবে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে নীতি নির্ধারণ তখন অসম্ভব হয়ে পড়বে রাষ্ট্রের পক্ষে। রাষ্ট্রের স্বার্থে ধর্মীয় নির্দেশ যুগের প্রয়োজন মেনে চলবে না কোনদিন। অন্যদিকে রাষ্ট্রকে হতে হয় যুগোপযোগী। ফলে ছোট ছোট ব্যাপারেও তখন দেখা দেবে বহু তর্কযুদ্ধ—অহিংসায় যার সমাপ্তি ঘটবে না কোন দিনই। পাক-সৈন্যদের প্যান্ট্ হাফ হবে কি ফুল হবে, য়ুরোপীয় হ্যাটের অনুকরণে তৈরী হেলমেট পরা আমাদের পুলিসদের পক্ষে জায়েজ কিনা ইত্যাদি হাজারো বহছের দরজা তখন খুলে দেওয়া হবে, যা প্যানডোরার বাক্সকেও হার মানাবে!

ধর্ম এক নয়, বহু। আবার প্রতি ধর্মের রয়েছে হাজারো ফেরকা। ইসলামও তার ব্যতিক্রম নয়। এক এক ধর্ম এক এক বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। রাষ্ট্র কিন্তু তা নয়, দেশের ভৌগোলিক সীমার অন্তর্গত সব সম্প্রদায় আর সব মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। এমনকি ধর্মহীন অবিশ্বাসীর জন্যও। ধার্মিকরা যাদের 'কাফের' বলেন তাদের জন্যও। নাস্তিককে রাষ্ট্র অস্বীকার করতে কিংবা কুফরী কি নাস্তিকতার অভিযোগে পারে না দণ্ড দিতে। ধর্ম কিন্তু পারে, দিয়েও থাকে দণ্ড। ধর্ম অবিশ্বাসীকে ইহলোকে একঘরে করতে পারে আর পরকালের জন্য পারে নরকবাসের ব্যবস্থা দিতে। রাষ্ট্র এ ধরনের কিছুই পারে না করতে, করলে ঐ দেশ রাষ্ট্র নামের যোগ্যতাই হারাবে। আমার বিশ্বাস ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্রের আর রাষ্ট্র দিয়ে ধর্মের কাজ কখনো পুরোপুরি চলতে পারে না। চালাতে গেলেই বিরোধ আর সংঘর্ষ অনিবার্য। স্রেফ মুসলিম রাষ্ট্রেও এ সম্ভব নয়। কারণ, মুসলমানদের মধ্যেও ফেরকার অন্ত নেই। শিয়া, সুন্নি, আহমদি, কাদিয়ানী, ওহাবী-মজহাবী-লামজহাবী ইত্যাদি ফেরকার কোন সীমা নেই। ধর্মীয় ব্যাপারে সব ফেরকারই ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আলাদা। ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার নামে প্যানডোরার বাক্সেও মুখ খুলে দেওয়া হলে প্রথম সমস্যাই দেখা দেবে কোন্ ফেরকার বিশ্বাস- আর আকিদা-অনুসারে পাঠ্যসূচী তৈরি করা হবে? রাষ্ট্র স্রেফ সংখ্যার দাবীতে কারো ধর্মীয় দাবী অস্বীকার করতে পারে না। শুধু কোরান-হাদিসের দোহাই দিয়েও এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ, কোরান-হাদিসের ভাষ্য আর ব্যাখ্যা নিয়েই তো এসব ফেরকার উৎপত্তি। মোটকথা, ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষাকে সব দেশের মতো আমাদের দেশেও বে-সরকারী পর্যায়ে বে-সরকারী নিয়ন্ত্রণেই রাখতে হবে। ধর্ম-শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ আমার মতে কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে সমস্যা আরো জটিল হয়ে দাঁড়াবে। এ বিতর্কের সূচনায় যে-বিরোধ আর সংঘর্ষ দেখা গেছে তা আরো বৃদ্ধি পাবে। আর এ বিরোধ আর সংঘর্ষ ঘটবে মুসলমানে মুসলমানে, পাকিস্তানী পাকিস্তানীতে।

শিক্ষা-সম্বন্ধে কয়েকটি মোটা কথা

ইংরেজ আমলে যে-শিক্ষা পদ্ধতি চালু ছিল তা-যে শুধু বহু যোগ্য মানুষ সৃষ্টি করেছে, তা নয়, অসংখ্য খাঁটি মুসলমান সৃষ্টিতেও তা কিছুমাত্র বাধা হয় নি। সে মুসলমানরা-যে এখনকার শিক্ষিত মুসলমানদের চেয়ে গড়পড়তা অনেক যোগ্য ও ভালো মুসলমান ছিল, সে সম্বন্ধে দ্বিমতের অবসর আছে বলে মনে হয় না। সে শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল অনেকখানি স্বচ্ছ, স্পষ্ট, সরল আর সাধারণের বোধগম্য। গত দুই দশকে সে স্পষ্ট আর অর্থপূর্ণ ব্যবস্থাকে নানা কমিশনের নানা উদ্ভট আর অবান্তর সুপারিশের মারপ্যাঁচে ফেলে এখন স্রেফ ঘোলাটে, দুর্বোধ আর ছাত্রদের জন্য এক দুর্বহ বোঝা করে তোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে শিক্ষা নিয়ে এমন 'তোগলকী' কাণ্ড আর কখনো ঘটে নি। পাকিস্তান পরবর্তী শিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে পাকিস্তান-পূর্ববর্তী শিক্ষিত মুসলমানের তুলনা করে দেখলে সার্বিক যোগ্যতা আর আচার-আচরণে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা মনে হয় এ 'তোগলকী' নীতিরই পরিণতি। তাই পুনরাবৃত্তি করছি: 'ফলেন পরিচীয়তে'। সব নীতি আর পদ্ধতির এ-ই একমাত্র লক্ষ্য।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, পাকিস্তান আন্দোলনে যাঁরা শরীক হয়েছেন, আর এ আন্দোলনকে যাঁরা সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন, এ বাইশ বছর ধরে আমাদের শাসনব্যবস্থা আর দেশের নিরাপত্তাকে যাঁরা খাড়া আর চালু রেখেছেন, তাঁরা সবাই কি বৃটিশ-প্রবর্তিত সেই পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতিরই ফসল নন? শুধু রাজনীতি আর প্রশাসন-ক্ষেত্রে নয়, আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি সমাজ-জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে যাঁরাই কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরা সবাই সে শিক্ষায় শিক্ষিত। আমাদের সমগ্র বিচার বিভাগ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, আর সব রকম স্কুল-কলেজগুলি সবই তো আজো পরিচালিত হচ্ছে সেই প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারাই। আমাদের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য পত্রিকা সাময়িকীগুলির পরিচালক আর সম্পাদকরাও সে শিক্ষায় শিক্ষিত।

এমনকি মুসলিম ইতিহাস, আইন আর শাস্ত্র ইত্যাদি নিয়েও যাঁরা উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন, তাঁরাও সে শিক্ষাপদ্ধতিরই ফসল। সে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ, এমন কথা বলা দৃশ্যমান সত্য আর বাস্তবকে অস্বীকার করা ছাড়া কিছুই না। ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি স্রেফ কেরানীই তৈরি করেছে বা সে শিক্ষাপদ্ধতির একমাত্র লক্ষ্য ছিল শুধু কেরানী বানানোই, এমন ঢালাও মন্তব্য যাঁরা করেন, তাঁরাও সে শিক্ষাপদ্ধতির সার্বিক ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে শুধু মনগড়া কথাই বলে থাকেন। এক সময় ঐ ধরনের বেপরোয়া কথা বক্তাদের খুবই জনপ্রিয় ছিল। প্রচুর হাততালিও তাতে পাওয়া যেতো। হাততালির প্রলোভনও কম সংক্রামক নয়। মনে হয় দেশের কিংবা মুসলমান সমাজের সার্বিক অগ্রগতির কোন খবরই এসব বক্তারা রাখেন না। আমাদের আর্থিক অবস্থা আর সামাজিক ব্যবস্থা তখন যে স্তরে ছিল, অধিকন্তু যে-রকম বিলম্বে আমাদের যাত্রা হয়েছিল শুরু, তাতে এর বেশী ফললাভের আশা করা যায় না। যে-বিপুল বাধা আর দুস্তর অন্তরায় ছিল মুসলমান সমাজের সামনে, সে-সবও ত ডিঙ্গিয়েছেন এ বহুনিন্দিত শিক্ষার ছোঁওয়া যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরাই। (বলা বাহুল্য কলকাতার সুবিখ্যাত আলিয়া মাদ্রাসাও ইংরেজেরই সৃষ্টি।)

সব সাফল্যের প্রতি অকারণে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে নিন্দায় পঞ্চমুখ হওয়া কোন কোন মানুষের সহজাত স্বভাব। জনপ্রিয়তার আকর্ষণ থাকলে সে স্বভাব সহজেই বেপরোয়া আর কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে ওঠে। ইংরেজ আর ইংরেজীর পাইকারী নিন্দা আর বিরুদ্ধতাও তেমন কাণ্ডজ্ঞানহীনতারই এক নজির। এখানে জিজ্ঞেস করা যায়ঃ ইংরেজী ছাড়া পাকিস্তান এত দ্রুত আর সহজে বাস্তবায়িত হতো কি? হলেও বিলম্বিত-যে হতো, তাতে সন্দেহ নেই। স্বয়ং কায়েদে আজম আমাদের জাতীয় ভাষার কোনটাই ভাল জানতেন না। তাঁর রাজনৈতিক ভাষা ছিল ইংরেজী। ইংরেজীর সাহায্যেই পাকিস্তান সমস্যাকে তিনি শুধু সর্বভারতীয় নয়, আন্তর্জাতিক সমস্যায় উন্নীত করেছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য কায়েদে আজমের উদ্যোগে যে-দৈনিক পত্রিকা-খানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা আজো সগৌরবে চলছে, তারও ভাষা ইংরেজী। একথা বললেও বোধ করি কিছুমাত্র মিথ্যা বলা হবে না যে, এ বাইশ বছর ধরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেছে একমাত্র ইংরেজী—দুই

অংশে সংহতিরও মাধ্যম আজো ঐ ভাষাই। আমাদের জাতীয় ভাষার কোনটাই সে ভূমিকা পালনের যোগ্যতা এখনো অর্জন করতে পারে নি। আরো দীর্ঘকাল এ অবস্থাই-যে চলতে থাকবে তাতেও বোধ করি সন্দেহ নেই। তাই অন্য কোন কারণে না হলেও অন্তত জাতীয় সংহতির খাতিরে ইংরেজী ভাষার স্থান আরো বহুকাল আমাদের পাঠ্যসূচীতে রাখতেই হবে। কাজেই এ ভাষার শিক্ষার ব্যাপারে কোন রকম শৈথিল্যের প্রশ্রয় দেওয়া হলে পরিণামে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাতে ইংরেজী ভাষার কিছুমাত্র এসে যাবে না। কথায় কথায় জাতীয় সংহতির বুলি যাঁরা আওড়ান, তাঁরা সমস্যার এদিকটা ভেবে দেখেছেন কিনা জানি না। পূর্বাপর পরিণতি না ভাবাই আমাদের এক অভ্যাস, তাই মনে সংশয় জাগে।

জাতীয় ভাষার উপর গুরুত্ব না দেওয়া বা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে জাতীয় ভাষাকে অবিলম্বে চালু না করার জন্য আমার এসব কথা বলা নয়। আমি শুধু দেশের বর্তমান পরিস্থিতি আর বাস্তব অবস্থার প্রতি শিক্ষক আর শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। নতুবা জাতীয় ভাষাকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করা হোক, শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে জাতীয় ভাষা চালু হোক, এ আমিও মনে-প্রাণে কামনা করি। কিন্তু সে সঙ্গে এও মনে রাখা প্রয়োজন, জাতীয় জীবনে এমন কিছু আছে, যা জাতির অস্তিত্ব আর বিকাশের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; যা চাওয়ামাত্রই পাওয়া যায় না, দাবীর সাথে সাথে যার সরবরাহ অসম্ভব; যা নানা স্তর পার হয়ে ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতায় যখন পৌঁছে, তখনই তা জাতির মন-মানসে সহজগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। শিক্ষা তেমন একটি বস্তু—ওখানে তাড়াহুড়া করে, পূর্বাপর বিচার না করে হঠাৎ রদবদলের রোলার চালাতে গেলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতির শিক্ষিত জনশক্তি তৈরির কারখানা আর রাষ্ট্র ও সমাজ-দেহের সব চাহিদার সরবরাহ-কেন্দ্র। ওখানে ত্রুটি ঘটলে, দুর্বলতা আর বিপর্যয় দেখা দিলে তা সারা রাষ্ট্র-দেহ আর সমাজ-জীবনকেই দুর্বল আর পঙ্গু না করে ছাড়বে না।

শিক্ষা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার—শিক্ষাদান আর শিক্ষাগ্রহণ দু-ই। এর পেছনে দীর্ঘ প্রস্তুতি চাই, বিশেষ করে মানসিক প্রস্তুতি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর অভ্যাসের ফলে শিক্ষকরা নিজেদের কর্তব্য আর দায়িত্ব-সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন, ছাত্ররাও নিজেদের পঠিতব্য সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট পূর্ব-ধারণা নিয়ে

শিক্ষার পথে পা বাড়ায় আর সবচেয়ে বড় কথা, এ-রকম অবস্থায় অভিভাবকদেরও জানা থাকে, ছেলেমেয়েরা কি কি বিষয় পড়ছে, জীবনে তা কতখানি কাজে আসবে, ভবিষ্যতে জীবিকার পথ তাদের সামনে খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা এতে কতটুকু ইত্যাদি। এসবের প্রধান শর্ত শিক্ষা-সূচী আর শিক্ষাপদ্ধতিতে স্থিতিশীলতা। স্থিতিশীলতা মানে জড়তা নয়, কালের বা সমাজের প্রয়োজন আর চাহিদাকে অস্বীকার করে স্থাণু হয়ে বসে থাকা নয়। তবে বিবর্তনের গতি ধীরে ধীরে আর ধাপে ধাপে হওয়া চাই। এক একটা ধাপ জাতির বা সমাজের ব্যবহারিক আর মানসিক অভিজ্ঞতার অঙ্গ হয়ে ওঠার পর, তবেই পরবর্তী ধাপের জন্য যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়। অভিজ্ঞতা আর অভ্যাসকে আমল না দিয়ে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে এখন যে-ওলট-পালট ঘটানো হয়েছে ও হচ্ছে, তার পরিণাম ভেবে শিক্ষাবিদমাত্রেই চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারে না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন যে-দ্রুত আর সার্বিক অবক্ষয় ঘটে চলেছে, তা কারো চোখ এড়াবার কথা নয়। শিক্ষা জিনিসটা এক সার্বিক ব্যাপার, জীবনের সর্বস্তর জুড়ে তার প্রভাব। এখন একদিকে লেখাপড়ার মান যেমন অধঃপাতের দিকে এগিয়ে চলেছে, তেমনি নৈতিকতাও আজ অবনতির চরম পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। সমাজ থেকে তো বটেই, শিক্ষাজীবন থেকেও নৈতিক চেতনা আজ অন্তর্হিত। এর সঙ্গে শিক্ষার নীতি আর পদ্ধতির কিছুমাত্র যোগাযোগ নেই, তা বলা যায় না। রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক জিনিস। শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। স্বভাবে আর চরিত্রে দুই-ই বিপরীত। তাই সব উন্নত দেশে শিক্ষাকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। কথায় কথায় তারা শিক্ষা সংস্কারে হাত দেয় না। ইংলণ্ডের মতো বুনিয়াদী গণতন্ত্রের দেশেও সরকারের পতন আর রদবদল ঘটে। তাই বলে শিক্ষাপদ্ধতিতেও সঙ্গে সঙ্গে রদবদল ঘটাতে তারা উঠে-পড়ে লাগে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে সুফল পেতে হলে একটা ধারাবাহিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন এ সত্যটুকু ঐ দেশের রাজনৈতিক দল আর নেতাদের শুধু-যে জানা তা নয়, তারা সেটা মেনেও চলে। যে-শিক্ষাপদ্ধতির উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছিলাম, তা মোটেও মন্দ ছিল না। তার থেকে যথেষ্ট সুফল আমরা পেয়েছি, তার থেকে যোগ্যতম মানুষের আবির্ভাব যে আমাদের সমাজেও ঘটেছে, সে কথার ইঙ্গিত উপরে দেওয়া হয়েছে। ঐ শিক্ষাপদ্ধতির অধিকাংশ ফসল যদি কেরানীও হয়, তাতেও অবাক হওয়ার কারণ নেই। কারণ,

যে-কোন রাষ্ট্রের প্রশাসন-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গই কেরানী—তারাই সব প্রশাসন-ব্যবস্থার বেসিক বা মৌলিক বুনিয়াদ, নিম্নতম ভিত ও স্তর, যার উপর সমস্ত রাষ্ট্র-প্রাসাদের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। ওরা ছাড়া রাষ্ট্র বা প্রশাসন-ব্যবস্থা কল্পনা করাই যায় না। আমাদের এ স্বাধীন রাষ্ট্রেও এখনো কি সব প্রশাসনিক বিভাগের অধিকাংশই কেরানী নয়? এমন কোন শিক্ষাপদ্ধতি কল্পনা করা যায় না, যার যতদূর মনে পড়ে, শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় রদবদলের সুপারিশ করার জন্য ইংরেজ দেড় শ' বছরে একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য কমিশন বসিয়েছিল। যা 'স্যাডলার কমিশন' নামে পরিচিত। ওটাকে 'কলকাতা কমিশন'ও বলা হতো। সে কমিশনের সব সদস্যের নাম আমার মনে নেই—স্যার আশুতোষ মুখার্জি আর ডক্টর জিয়াউদ্দিনের নাম মনে পড়ছে। ডক্টর হার্টগ, যিনি পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন সম্পাদক আর স্যার এ. এফ. রহমান (তখন অবশ্য স্যার হন নি) সহকারী সম্পাদক ছিলেন ঐ কমিশনের। এঁরা সবাই শিক্ষাবিদ আর শিক্ষায় আত্মনিবিষ্ট মানুষ। শিক্ষা-সম্বন্ধে এঁদের অভিজ্ঞতা দীর্ঘ আর সন্দেহাতীত। ঐ কমিশনে কোন রাজনীতিবিদ কিংবা প্রশাসনিক অফিসারের স্থান ছিল না। সামরিক অফিসারের কথা তো ভাবাই যায় না। আর ছিল না ওদের উপর সরকারী কোন নির্দেশ—ওঁদের দেওয়া হয়েছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সুপারিশ করার এখতিয়ার। এ কমিশনের রিপোর্ট পরে প্রকাশিত হয়েছিল কয়েক খণ্ডে। এ দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা আর তার সংস্কার-সম্বন্ধে ঐ রিপোর্ট এক প্রামাণ্য দলিল। ঐ কমিশনের সুপারিশের অন্যতম ফলশ্রুতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। খুব সম্ভব নিউ স্কীম মাদ্রাসাগুলিও তারই জের। এ সবের জন্য অবশ্য প্রস্তুতি নানাভাবেই নেওয়া হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। যেমন, নিউ স্কীম মাদ্রাসার সিলেবাস রচনা কিভাবে করা হবে, কি ধরনের আরবী ওখানে শেখাতে হবে, তা জানার জন্য মরহুম শামসুল ওলেমা আবু নসর ওয়াহীদ সাহেবকে সরকার মিসরের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি আর পাঠ্য-বই ইত্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে আসার জন্য মিসরে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সে অভিজ্ঞতার আলোকেই, নিউ স্কীমের সিলেবাস তৈরি হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ু প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চললো। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে গত কয়েক বছরের ঘটনাবলী বাদ দিলে এ দীর্ঘকাল এ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন, অধ্যাপনা আর পরিচালনা ব্যাপারে একটা সুস্থ ঐতিহ্য ধারা রক্ষা করে এসেছে।

ফলে আমরা আজ দেশের প্রশাসন ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপন্নদেরই দেখতে পাচ্ছি। এমন কি, সচ্ছল ও অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলেদের কাছে উপেক্ষিত আর সাধারণ বিভাগের ছাত্রদের কাছে উপহসিত নিউ স্কীম থেকেও বহু কৃতবিদ্য ও যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব-যে ঘটেছে, তাও বোধ করি অস্বীকার করার উপায় নেই। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত ডি. পি. আই. মিঃ এ. এফ. এম. আবদুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মরহুম আবদুল হাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন এবং আরো অনেকের আদ্য, মধ্য কারো কারো অন্ত্য শিক্ষাও এ লাইনেই হয়েছে। শুনেছি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শওকত ওসমানেরও আদি শিক্ষা এ ধরনের মাদ্রাসাতেই শুরু। সকলের নাম উল্লেখ করতে গেলে ফিরিস্তি দীর্ঘ হয়ে পড়বে, তাই তা করা থেকে বিরত রইলাম। না হয় এ পদ্ধতিও-যে ব্যর্থ প্রমাণিত হয় নি, তার নজির অনেক। মোটকথা, শিক্ষা থেকে সুফল পেতে হলে তাতে ঘন ঘন হস্তক্ষেপ করা অবাঞ্ছনীয়। যতদিন হস্তক্ষেপ ঘটে নি, ততদিন প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে আমাদের সমাজ ও দেশ উপকৃত হয়েছে। আমাদের উপযুক্ততা-অনুসারে রাজনৈতিক ও সামাজিক চাহিদা-যে ঐ শিক্ষা থেকে মোটামুটি মিটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। মেটে নি বলা স্রেফ সত্যের অপলাপ করা। প্রমাণ আমাদের প্রশাসন-ব্যবস্থা কখনো অচল হয়ে থাকে নি। ক্ষমতালোভীদের হস্তক্ষেপের ফলে যদি কখনো অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে, সে অন্য কথা, তার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা দায়ী নয়। গত বাইশ বছরে কত সরকারই এলো, কত সরকারই গেলো। দেখে অবাক হতে হয়, যে-সরকারই আসে সে-সরকারই অমনি তড়িঘড়ি একটা শিক্ষা কমিশন বসান, শিক্ষা সংস্কারের নামে রাতারাতি শিক্ষার ক্ষেত্রে ওলটপালট তথা রীতিমতো একটা অরাজকতা ডেকে না এনে তাঁরা যেন কিছুতেই স্বস্তি পান না। দেশের সামনে সহস্র সমস্যা আশু সমাধানের প্রতীক্ষায়। সে সবে হাত না দিয়ে তাঁরা কেন-যে অকারণে শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন, তা আমার মতো লোকের বুদ্ধির অগম্য। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাঁরা বসেন, তাঁদের অনেকে যথারীতি শিক্ষিতও নন, তবুও শিক্ষা নিয়ে অনধিকার-চর্চা তাঁদের করা চাই-ই। আইয়ুব আমল থেকেই এ অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে।

সাধারণত দেশের কোন একটা বিশেষ অবস্থা আর অবাঞ্ছিত প্রেক্ষিতের মোকাবিলার জন্যই সামরিক শাসন জারি হয়ে থাকে। সেটার অবসান বা সমাধান ঘটলেই সামরিক শাসনেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তাই সামরিক শাসন এক অস্থায়ী স্বল্প-মেয়াদী ব্যাপার। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা কিন্তু তা নয়—তা স্থায়ী আর দীর্ঘ-মেয়াদী। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বহু স্তর পার হওয়ার পর তাতে যদি কোন রদ-বদল ঘটানোর প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই মাত্র তা করা উচিত। আর তা করা উচিত অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ আর অরাজনৈতিক শিক্ষাবিদদের পরামর্শ আর সুপারিশ-অনুযায়ী। সামরিক বিভাগের লোকদের শিক্ষা-দীক্ষা-অভিজ্ঞতা আর ট্রেনিং সম্পূর্ণ আলাদা এবং তা কিছুটা সঙ্কীর্ণ পরিধিতেই আবর্তিত। এ অবস্থায় শিক্ষার মতো দীর্ঘ-মেয়াদী এবং বে-সামরিক বিষয়ে তাঁদের পক্ষে যথাযথ সুবিচার আশা করা যায় না। শিক্ষা জাতীয় জীবনের বুনিয়াদী ব্যাপার বলে এতে যে-কোন ভুল পদক্ষেপ অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন পরিবর্তন ঘটানো মানে ভবিষ্যৎ শাসকদের সামনে একটা অনুরূপ প্রলোভনের উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া। তখন তাঁরাও আর এক প্রস্থ রদবদল ঘটানোর জন্য অদম্য হয়ে উঠবে অর্থাৎ এভাবে চলতে থাকবে থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। শিক্ষায়তনগুলি অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষার ক্ষেত্র নয়; শাসন, পরিচালন আর নিয়ন্ত্রণেরও ক্ষেত্র। শিক্ষার সাথে সাথে শাসনও যুগপৎ সমতাল না চললে শিক্ষা কখনো পূর্ণ আর সুফলপ্রসূ হতে পারে না। শিক্ষা-দানের ষোল আনা দায়িত্ব শিক্ষকদের হাতে থাকবে আর শাসন-পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যদি ছাত্র আর শিক্ষকদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে পড়ে অর্থাৎ অপরিণত-বুদ্ধি, শাসন ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছাত্রদেরও যদি শাসনের অধিকার দেওয়া হয়, তা হলে শিক্ষায়তনে শুধু-যে অসম্ভব বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তা নয়, পুরোপুরি অচলাবস্থার সৃষ্টিও-যে হবে না, তাও জোর করে বলা যায় না। সুশাসনের জন্য পরিণত বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা অত্যাবশ্যকীয়। আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রের শিক্ষা-জীবনের ভিত ওখানেই রচিত হয় আর গড়ে ওঠে। ওখানকার পাঠ্যসূচী যথাসম্ভব সরল, জটিলতামুক্ত হওয়া উচিত। পরিমাণের উপর জোর না দিয়ে গুণের উপর জোর দেওয়া হলেই ভালো ফলের সম্ভাবনা বেশী।

তা হলেই ভিতও পাকাপোক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। আগে তাই ছিল। তাই তখনকার লেখাপড়ার ভিত এমন কাঁচা আর নড়বড়ে ছিল না। এখন বিষয়ের সংখ্যা-বৃদ্ধি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অসম্ভব জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ছাত্রদের স্বাভাবিক বহন-শক্তির অনেক বেশী বোঝা তাদের উপর এখন চাপানো হয়। এ অবস্থা মানসিক বিকাশ কিংবা লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির অনুকূল নয়। পরীক্ষায় দুর্নীতি বৃদ্ধির এটিও অন্যতম কারণ বলে মনে হয়।

মাধ্যমিক স্তরে পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, অর্থনীতি, পৌরনীতি ইত্যাদি পড়ানোর কোন মানে হয় না—বারো-তেরো কি চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে-মেয়েদের মাথায় এগুলি ঢোকার কথা নয়। বিষয়ের বিভক্তিকরণের জন্য ইন্টারমিডিয়েট স্তরই প্রশস্ত। অতীতে তাতে যথেষ্ট সুফল ফলেছে। এখন এমন একটা জগাখিচুড়ি সৃষ্টি করা হয়েছে যে, ফলে ভাষা জ্ঞানটাও যথাযথভাবে আয়ত্ত হয় না ছেলেমেয়েদের। এর ফলে জ্ঞানচর্চার ভিতটাই থেকে যায় কাঁচা। আমার মতে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচী মাতৃভাষা, অঙ্ক, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, সহজ ব্যবহারিক বিজ্ঞান, সরল স্বাস্থ্যবিধি আর একটা ক্লাসিক্যাল ভাষার মধ্যেই সীমিত রাখা উচিত। বিষয়-নির্বাচন শুরু হওয়া উচিত ইন্টারমিডিয়েট থেকেই। তার আগে নির্বাচন অর্থহীন। কারণ এ-সময় ছাত্রদের মনে বিশেষ কোন প্রবণতার জন্ম আর বিকাশ আশা করা যায় না। ইন্টারমিডিয়েট স্তরেই তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। তখন যাচাইয়ের বুদ্ধি আর বয়সও হয়ে থাকে ছাত্র-ছাত্রীদের।

আমার বক্তব্য : অকারণে শিক্ষাপদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। একটা পদ্ধতিকে স্থির ও স্থিতিশীল হওয়ার সুযোগ দেওয়া হলেই তা শিক্ষক, ছাত্র আর অভি-ভাবকের অভিজ্ঞতার অঙ্গ হয়ে ওঠে আর তখনই হয় সুফলপ্রসূ। আমি মনে করি, যে-শিক্ষা পদ্ধতির ফসল দিয়ে পাকিস্তান হাসিল হয়েছে, সে-পদ্ধতির ফসল দিয়ে তাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তোলাও সম্ভব। বিশেষত মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাসূচী সরল ও জটিলতামুক্ত হওয়া চাই। সরল মানে সহজ নয়, সরল অর্থে পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা কমিয়ে বিষয়ের ভার কমানো, তা হলেই প্রতিটি বিষয়ের উপর যথাযথভাবে মনোযোগ আর জোর দেওয়া সম্ভব হবে ছাত্র আর শিক্ষক উভয়ের পক্ষে। অর্থাৎ পরিমাণের উপর জোর না দিয়ে জোর দেওয়া উচিত গুণের উপর। আমার বিশ্বাস, তা হলে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক অপচয় রোধ করা যাবে।

সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে শিক্ষা-সম্পর্কে দুটি কথা

Honest words should not be hushed up : Let everyone hear !
—Euripides.

ধর্ম মানবমনীষা আর উপলব্ধির এক দুর্লভ কৃতিত্ব আর সম্পদ। ধর্মের কাছে মানুষ পায় আত্মজ্ঞান, অতীন্দ্রিয় জিজ্ঞাসার প্রেরণা, আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় শান্তি ও সান্ত্বনা। ধর্ম মানুষকে দেখিয়েছে বিশ্বাস, ভক্তি, বিনয়, ক্ষমা, করুণা আর আত্ম-নিবেদনের পথ। দিয়েছে শৃঙ্খলা আর সংযত জীবনে দীক্ষা। সব ধর্মগ্রন্থই জ্ঞান আর মূল্যবোধের এক-একটা অখণ্ড আকর। তা কোটি কোটি মানুষের প্রতিদিনের জীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনেকের কাছে এগুলি ক্ষুধায় খাদ্য, রোগে ঔষধ আর তৃষ্ণায় পানীয়ের সমতুল্য। শোকে-দুঃখে, আনন্দে-উৎসবে ধর্ম মানুষের সঙ্গী—এমন কি জন্ম-মৃত্যুতেও স্মরণীয় আর অপরিহার্য। ধর্মের এ ভূমিকা আর অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। সে সঙ্গে এও বোধ করি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ধর্ম বা ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত অনর্থ ঘটেছে বা ঘটানো হয়েছে, তারও কোন তুলনা নেই। একক অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে এত সংঘর্ষ, এত রক্তপাত, এতখানি ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ঘটেছে কিনা সন্দেহ। ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্ট একই ধর্মের সন্তান—তবুও এ দু'য়ের বিরোধ মধ্যযুগের এক কলঙ্কময় ইতিহাস। অশরীরী ধর্ম-বিশ্বাস বা ব্যাখ্যার সামান্য পার্থক্যের জন্য মানুষ অসংখ্য জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারতেও দ্বিধা করে নি। ধর্মের নামে সেদিন অমানুষিক বর্বরতায় মানুষ বনের হিংস্র পশুকেও গিয়েছিল ছাড়িয়ে। চাঁদে গেলে কি হবে—এ কলঙ্কের জের মানব-সমাজ থেকে আজো নিঃশেষিত হয় নি।

ইসলামের ইতিহাসেও যে-বিরোধ আর সংঘর্ষের সূচনা তাও আল্লাহ্ বা রসুলকে নিয়ে নয়, ধর্মের দিক থেকে অত্যন্ত অপ্রধান বিষয়ে মত-পার্থক্যেরই ফল। 'খারেজি'দের আবির্ভাব থেকে শুরু করে শিয়া-সুন্নি, আহমদী কাদিয়ানী-ওহাবী-অ-ওহাবী ইত্যাদির অসংখ্য সংঘর্ষের দিকে তাকালে দেখা যাবে সর্বত্রই ভাষ্য বা

ব্যাখ্যার হেরফের নিয়েই যত গণ্ডগোলের সূত্রপাত। এর থেকেই যত 'ফেরকা' আর সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। ফলে মুসলমানের হাতে মুসলমানের যত রক্তপাত ঘটেছে অমুসলমানের হাতে, আমার বিশ্বাস, তার সিকি পরিমাণও ঘটে নি! ইসলামের মৌল বিশ্বাস বা তার 'পাঁচ রোকন্' নিয়ে ঘটে নি এসব সংঘর্ষ, ঘটেছে অপ্রধান বা মামুলী বিষয় নিয়েই। এমন কি মিলাদে 'কেয়াম' কিংবা আয়াৎ বিশেষের 'জের, জবর, পেশ' নিয়েও আমাদের মৌলবী-মওলানাদের 'বহুছ' বা তর্ক কি করে মুখ থেকে হাতে আর হাত থেকে ডাণ্ডায় নেমে আসে তা অনেকেরই দেখা। এসব 'বহুছে'র পরিণতি খুব কম ক্ষেত্রেই 'অহিংস' হয়ে থাকে। হযরত রসুলে করীমের ওফায়েত মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যেই 'জঙ্গে জমল' বা উষ্ট্রের যুদ্ধ আর 'সিফফিনের' লড়াই হয়েছে। দুই পক্ষই মুসলমান, দুই পক্ষেই হযরতের জীবিত সাহাবীরা শরিক হয়েছেন। 'সিফফিনের' যুদ্ধ-সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "হাতিয়ার হাতে মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানের মুখোমুখি হয়ে। এখনো অনেকের কানে রসুলে করীমের বিদায় হজের আকুল আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে: 'এক মুসলমানের জীবন' ইজ্জৎ ও সম্পত্তি অন্য মুসলমানের কাছে পবিত্র হজের মাস ও পবিত্র কাবাগৃহ থেকেও অধিকতর পবিত্র।' হযরতের মুখ-নিঃসৃত এ-বাণী স্বকর্ণে শুনেছেন দুই দলে এমন লোক বহু।" (হযরত আলী: কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড সংস্করণ।)

তবুও এ আত্মঘাতী যুদ্ধের হাত থেকে ইসলাম রেহাই পায় নি আর তাতে মুসলমান ঐতিহাসিকদের হিসেবেই নব্বই হাজার মুসলমান হয়েছিল নিহত। 'জঙ্গে জমল' ও 'জঙ্গে সিফফিনের' বিরোধের বিষয় ছিল তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ। এক পক্ষের দাবী প্রতিশোধ নিতেই হবে, অন্য পক্ষের জবাব প্রতিশোধ গ্রহণে তাঁরা অক্ষম। ফলে শুরু হলো যুদ্ধ, ভ্রাতৃরক্তপাত। এই দুই যুদ্ধে লক্ষাধিক মুসলমান নিহত হয়েছে। নিহতদের 'শহীদ' আর জীবিতদের 'গাজী' যাই বলা হোক না কেন, তাতে ধর্মের দিক থেকে, মানবতার দিক থেকে, দেশ আর জাতির দিক থেকে আর নিহতদের পরিবার-পরিজনদের দিক থেকে দেখলে বিন্দুমাত্র লাভ বা ফায়দা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে স্রেফ দুঃখ, হতাশা আর মর্মবেদনা। ধর্মের লেবাছে অন্ধ আবেগ আর নির্বুদ্ধিতা মানুষকে-যে কতখানি আত্মঘাতী করে তোলে এসব তারই নজির।

ইতিহাস আমাদের সামনে তার পাতা খুলে ধরেছে, তার থেকে পাঠ করে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। তা নেওয়ার ক্ষমতা অর্থাৎ বুদ্ধি, যুক্তি আর মস্তিষ্ক আমাদের দেওয়া হয়েছে। এসব দেওয়া হয়েছে বলেই আমরা র‍্যাশনাল বিয়িংস্। র‍্যাশেনালিজমের বড় লক্ষণ: বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করা আর হওয়া যথাসম্ভব সহিষ্ণু, সংযত এবং যুক্তিবাদী। ইররাশনাল হতে এ-সবের কোন প্রয়োজন পড়ে না।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র কেন্দ্রে যে-মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, সে প্রসঙ্গেই উপরের কথা আর ইতিহাস আমার স্মরণে জেগেছে। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আর পরিধিতে এ হয়তো অতখানি সুদূরপ্রসারী নয়। তবুও ভেবে দেখলে দেখা যাবে স্বভাবে আর চরিত্রে এমন কি চেহারায়ও এতে সাদৃশ্য রয়েছে। এখানেও সেই মুসলমানে মুসলমানে সংঘর্ষ, মুসলমানে মুসলমানের রক্তপাত। এদিনের তর্ক বা বিরোধের বিষয়ের সঙ্গেও ইসলামের মূল বিশ্বাস আর বিধি-বিধানের কোন সম্পর্ক ছিল না। অতি তুচ্ছ এক মামুলী ব্যাপার—সরকারের নয়া শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা। আরো হাজারো বিষয়ের মতো এ বিষয়েও মত-পার্থক্য থাকা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। অধিকন্তু ইসলামী শিক্ষাপদ্ধতি দাবী করা যেমন ঈমানের অঙ্গ নয়, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি দাবী করাও ঈমানের বরখেলাপ কিছু নয়। বলা বাহুল্য, ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীন নয়। আমি আমার পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি বৃটিশ আমলে শিক্ষা-পদ্ধতি ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিল বটে, কিন্তু তার থেকে বহু খাঁটি ও ধার্মিক মুসলমানের যে-আবির্ভাব ঘটেছে, তাও সম্পূর্ণ সত্য। মরহুম ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ধাপ পর্যন্ত ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাই লাভ করেছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন আমাদের সামনে খাঁটি ধার্মিকের আদর্শ। ইসলামী ভাষা আর শাস্ত্রে তাঁর যে-পাণ্ডিত্য তা ছিল তাঁর স্বোপার্জিত, ব্যক্তিগত অধ্যয়ন-অনুশীলনের ফল, জোর করে 'আরোপিত' নয় মোটেও। আমার বিশ্বাস কোন বিদ্যাই ধর্মের পথে বাধা হতে পারে না যদি নিজের অন্তরে কিছুটা ধর্মবোধ থাকে। বাধা হতে পারার আশঙ্কা থাকলে হযরত নবী করীম কিছুতেই বলতেন না: 'সম্ভব হলে চীন দেশে গিয়েও এলেম হাসিল করো।' ইতিহাস বলে তখন চীন দেশে ইসলামী শিক্ষাপদ্ধতি চালু ছিল না। তাঁর নির্দেশের অর্থ সব জ্ঞানই মুসলমানের জন্য হালাল—মুসলমানকে সব জ্ঞানেই জ্ঞানী হতে হবে। শক্তির বীজমন্ত্র এখানেই নিহিত।

কাগজে দেখলাম সেদিন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে যে-ছেলেটি মারা গেছে সে জৈব-রসায়নের ছাত্র ছিল। যে-কোন সংজ্ঞা-অনুসারে জৈব-রসায়ন ধর্ম-নিরপেক্ষ বিষয়। তবুও তার পক্ষে ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মী হয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হতে বাধে নি। মোটকথা, ধর্ম-নিরপেক্ষ বিষয় অধ্যয়ন করলেই মানুষ ধর্মহীন বা ধর্মে আস্থা হারায় না, এ কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছি। আবার এমন মুসলমানও আমাদের অজানা নয় যাঁরা শুধু-যে মাদ্রাসা শিক্ষায় উচ্চতম শিক্ষা লাভ করেছেন তা নয়, ফখরুল মোহাদ্দেছীন ইত্যাদিও পাস করেছেন, অথচ তাঁরা যাপন করেন সম্পূর্ণ 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' জীবন। এ-রকম কেউ কেউ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবেও যথেষ্ট যোগ্যতার যে-পরিচয় দিয়েছেন, তা বোধকরি অনেকের জানা। এ প্রসঙ্গে এও স্মরণীয়, আমাদের জাতীয় কিংবা প্রাদেশিক পরিষদগুলিও 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টের আদর্শে গঠিত। এমন কি সেখানে যে-পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তারও কোনটা দেশী কিংবা ইসলামী নয়।

শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তর্কটা ছাত্রদের জন্য একারণেও তুচ্ছ আর ফজুল যে, তাদের সুপারিশ-কিংবা দাবী-অনুসারে শিক্ষাপদ্ধতি রচিত বা চালু হওয়ার কথা নয়, হওয়া উচিতও নয়। একদল ছাত্র যদি ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি দাবী করেও সরকার অমনি তা লুফে নেবে, না, তেমনি অন্য একটা দল যদি ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা-পদ্ধতি দাবী করে তা হলেও সরকার যে তাই গ্রহণ করবে, তার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই। রাষ্ট্রের চাহিদা আর প্রয়োজন অনুসারেই শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হয়ে থাকে। এ-ব্যাপারে রাষ্ট্রকে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের, ছাত্রদের নিশ্চয়ই নয়। ছাত্রদের এ ধরনের বিতর্কে টেনে আনার বা তাদের পরামর্শ চাওয়ার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ এ হবে তাদের জন্য সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা। অধিকারী-ভেদ কথাটা সব ব্যাপারেই প্রযোজ্য। অন্য কোন কারণে নয়, এ ব্যাপারে তাদের যোগ্যতার অভাব বলেই আমার বিরোধিতা। কান্না থামাবার অছিলায় শিশুর হাতে তলোয়ার তুলে দেওয়ার কোন মানে হয় না। 'খুশী করা' ব্যাপারটি সব সময় নিরাপদ নয়। আমাদের দেশে চাষী-মহলে একটি কথা চলিত আছে : গরুকে জিজ্ঞাসা করে চাষ করা যায় না। কথাটা স্থূল ; কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তেমন অবস্থায় চাষ চলতে পারে না কিছুতেই। ছাত্রদের ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'তালেবে এলেম' অর্থাৎ

বিদ্যান্বেষী। বিদ্যা তারা অধ্যয়ন করবে, কিন্তু কি বিদ্যা অধ্যয়ন করবে সে বিচারের ভার অভিভাবক, শিক্ষক আর শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের। পৃথিবীর কোন দেশে ছাত্রদের সুপারিশ-অনুসারে শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হয়েছে বলে আমি আজ পর্যন্ত শুনি নি! স্বভাবতই ছাত্ররা বয়সে, বুদ্ধিতে আর অভিজ্ঞতায় অপরিণত, শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এমন অপরিণতদের পরামর্শ নেওয়া বা চাওয়াও আমার মতে চরম অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। ছাত্ররা সাধারণত আবেগে চালিত আর আবেগে তাড়িত হয়ে থাকে। সেদিনের ঘটনা, যার থেকে আমার এ প্রবন্ধের উৎপত্তি, তার এক জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত।

একদিকে ধর্মের চেয়ে শান্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার দ্বিতীয়টি নেই, অন্যদিকে ধর্মের চেয়ে 'উত্তেজক' আর 'বিস্ফোরক'ও আর আছে কিনা সন্দেহ। যে-কোন ব্যাপারে ধর্মের নাম আর দোহাই নিয়ে এলে তখন আর মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ফলে যে-সংঘর্ষ দেখা দেয় তাতে ধর্মই হয় সর্বাগ্রে বলি! 'জঙ্গে-জমল' আর 'জঙ্গে সিফ্‌ফিনে' যে-লক্ষাধিক মুসলমান মুসলমানের হাতে নিহত হয়েছে তাতে ইসলামের একবিন্দু ফায়দাও হয় নি। বরং সেই সূচনার যুগে লক্ষাধিক মুসলমানকে হারিয়ে ইসলাম ও মুসলমান কি দুর্বল হয়ে পড়ে নি? মুসলমানের জীবনের চেয়েও ধর্মের নোকতা আর জের-জবর-পেশকে বড় করে দেখার এই পরিণতি!

'ধর্ম-নিরপেক্ষ' শিক্ষায় শিক্ষিতদের চেয়ে আমার বিশ্বাস আমাদের আলেমরা আরো বেশী ভালো করেই জানেন: কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। অন্যত্র আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে: 'তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার।' তবুও ধর্মীয় কোন ব্যাপারে সামান্য মতভেদ দেখা দিলেও তাঁরা 'তোমার মত তোমার, আমার মত আমার', 'Let us agree to differ' এ বলে সামান্য সহিষ্ণুতারও পরিচয় দেন না। বরং বাস্তবে তার বিপরীতই দেখা যায়। এ কারণে অনেক সময় অপ্রধান ধর্মীয় ব্যাপারের 'বহছ' মুখ থেকে হাতাহাতিতে, হাতাহাতি থেকে লাঠালাঠিতেই আর লাঠালাঠি থেকে মাথা-ফাটাফাটিতে নেমে আসতে দেখা যায়। এঁদের তুলনায় ছাত্ররা তো আরো অপরিণত আরো অল্প-বয়স্ক, আরো আবেগী। তাই তাদের বেলায় বিস্ফোরণ ঘটতে কিছুমাত্র দেরী লাগার কথা নয়। এমনিই তো দল আর দলাদলির ফলে দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম অবক্ষয় নেমে এসেছে—ছাত্রজীবনে দেখা দিয়েছে একটার পর একটা

বিপর্যয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার পরিবেশ আজ তিরোহিত বললেই চলে। এ অবস্থায় আবারও যদি নতুন করে ধর্ম নিয়ে তর্ক করার একটা সুযোগ সৃষ্টি করা হয় তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেটুকু শান্তি আজো বজায় আছে তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দু'দিনে। তখন ছাত্ররা আর 'তালেবে এলেম' থাকবে না, হবে 'তালেবে লাঠ্যম'!

রাষ্ট্রীয় জীবনে এমন বহু জিনিস আছে যা সম্পূর্ণভাবে পরিণত বুদ্ধির এলেকা। আমার বিশ্বাস শিক্ষা তেমন একটি এলেকা, তেমন একটি ক্ষেত্র। এখানে অপরিণত-বুদ্ধি ছাত্রদের ডেকে আনা হলে আর তার সঙ্গে যদি অতিমাত্রায় উত্তেজক ধর্মীয় বিতর্কের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র কেন্দ্রে যা ঘটেছে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে বার বার আর ঘন ঘন। কারণ ধর্মীয় কিংবা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যাপারেও দলাদলির আগুন যদি একবার জ্বালানো হয়, তাতে হাওয়া দেওয়ার লোকের অভাব হবে না কোনদিন। বিশেষত যেখানে ঘোলা পানিতে মৎস্য-শিকারীর অভাব নেই।

এবারকার সংঘর্ষে একটা বিশেষ দলের সমর্থক ছেলে মারা গেছে, এতো স্রেফ এক আকস্মিক ব্যাপার, অন্যদলের ছেলেও তো মারা যেতে পারতো। আবার এমনও তো দেখা গেছে, এ রকম মারামারিতে একদম নিরপরাধও মার খায় আর নিহত হয়। কোন্ দলের ছেলে মারা গেলো এটা তো বড় কথা নয়, বড় কথা আর সবচেয়ে শোচনীয়: দেশ আর জাতি তার এক অমূল্য সম্পদকে হারালো, মা-বাপ হারালো তাদের নয়নের মণিকে, ভাই-বোনেরা হারালো প্রিয়তম সহোদরকে, পরিবার হারালো তাদের আশা-ভরসাকে। 'শহীদ', 'লকব' বা 'গাজী' খেতাবে এসবের কখনো পূরণ হবার নয়—এতে মায়ের চোখের জল শুকোবে না, বাপের ভাঙা বুক লাগবে না জোড়া। এসব অকাল-মৃত্যুর এই অত্যন্ত মর্মান্তিক দিকগুলি দলীয় স্বার্থের উত্তেজনায় অনেকেই ভুলে থাকেন। দেখা গেছে ধর্মের ব্যাপারে মানুষ কখনো যুক্তিবাদী কিংবা সহিষ্ণু হয় না, হতে পারে না। ধর্মীয় বিতর্ক মানুষের আবেগকে এত বেশী উত্তেজিত করে তোলে যে, তখন হারিয়ে বসে সব কাণ্ডজ্ঞান। সুস্থ আর শান্ত অবস্থায় যে-মানুষ নিজের ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের পরমত-সহিষ্ণুতার উদার বাণী উদ্ধৃত করে স্ফীতবক্ষ হয়ে উঠেন, ধর্মান্ধ অবস্থায়, দেখা গেছে তেমন মানুষেরও ভ্রাতৃঘাতী হতে বাধে না। যে-ধর্ম মানুষের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ বলে তিনি দাবী করেন, দেখা যায় সে ধর্মকেই তিনি মারণাস্ত্র করে

তোলেন উত্তেজনার মুহূর্তে। ধর্ম আচরণের বস্তু, জীবনে পালিত না হলে তার কোন মূল্য নেই। জীবনের অঙ্গ না করে ধর্মকে তর্কের বিষয় করে তুললে যার জন্য ধর্ম সে মানুষকেই অস্বীকার করে ধর্মের উদ্দেশ্যকেই করে দেওয়া হয় ব্যর্থ। জোর করে অন্য যা কিছু করা যাক না কেন, মানুষকে ধার্মিক বানানো যায় না কখনো। 'ধর্মে জবরদস্তি নেই' এটি একটি সারগর্ভ উক্তি। জবরদস্তি সব সময় বিপরীত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়ে থাকে। অতি হাল আমলে আমাদের দেশে উর্দুর ব্যাপারে এ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আজাদীর বহু আগে থেকেই বাংলাদেশে স্বাভাবিক নিয়মেই উর্দু পড়ার চর্চা হতো উর্দু সাহিত্যের, উর্দু পণ্ডিতেরও অভাব ছিল না এদেশে; কিন্তু যেই একক রাষ্ট্রভাষার নামে জোর করে উর্দু চালাবার চেষ্টা হলো তখনই উর্দুর বিরুদ্ধে দেখা দিল প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া। এর ফলে উর্দু-ভাষী সজ্জনকেও লোকে শত্রু ভাবতে শুরু করে দিল। এমনকি ইকবালের মতো জনপ্রিয় অতি উচ্চাঙ্গের প্রতিভাবান কবিও এখন সরকারী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বাইরে পাত্তা পাচ্ছেন না এ কারণে। এ সত্যই দুঃখের, আর সংস্কৃতি-চর্চার দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু এর জন্য দায়ী অত্যুৎসাহী গোঁড়া উর্দু-প্রেমিকরাই। অত্যুৎসাহিতার ফলে ধর্ম আর ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারেও এ না ঘটে বসে।

ভল্টেয়ার বলেছেন: অস্ত্রের জোরে তুমি সারা পৃথিবী জয় করতে পারো, কিন্তু পারবে না একটা গ্রামেরও মানুষের মন বশীভূত করতে। ধর্ম সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি-মন আর বিশ্বাসের বস্তু, স্বতঃস্ফূর্ত আর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হলেই তা জীবনের অঙ্গ হয়ে আচারে-আচরণে রূপায়িত হয়। জবরদস্তিতে তা হওয়ার নয়। জোর-জবরদস্তি বড়জোর কিছু-সংখ্যক কৃত্রিম আর ভণ্ড ধার্মিক তৈয়ারি করতে পারে, কিন্তু তেমন ধার্মিক কোন ধর্মেরই গৌরবের বস্তু নয়। ধর্মশিক্ষার সুযোগ নিম্নতম থেকে উচ্চতম ধাপ পর্যন্ত থাকা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তা ঐচ্ছিক হওয়া চাই—বাধ্যতা-মূলক করলে শুধু অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি-যে হবে তা নয়, তার ফলে বহুতর জটিলতাও দেখা দেবে রাষ্ট্রীয় জীবনে। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হলেও এখানে শুধু ইসলামী ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে না। ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করার যাঁরা পক্ষপাতী, তাঁদের মুখে সচরাচর এ দাবীর কথা শোনা যায় না। পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় এক কোটির মতো হিন্দু আর কয়েক লাখের মতো বৌদ্ধ রয়েছে। স্কুল-কলেজে নির্বিচারে ইসলামী ধর্মশিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক

করা হলে যে-প্রবল বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হবে তা কিছুতেই রাষ্ট্রের জন্য শুভ হতে পারে না। ভারতেও যদি এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয় তখন দশাটা কেমন হবে? ওখানে প্রায় পাঁচ কোটি মুসলমান আছে, হিন্দু-ধর্মশিক্ষা যদি ওদের উপরও বাধ্যতামূলকভাবে চাপানো হয় তখন ওদের দশা যা হবে তা কল্পনা করা খুব কঠিন নয়। ভারত আর পাকিস্তান এত পাশাপাশি আর এত কাছাকাছি যে, একের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অন্যের উপর না হয়ে পারে না। দাঙ্গার ব্যাপারেও এ দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, আমি ধর্মশিক্ষার বিরোধী নই। তবে আমার মত, তা অপসনাল্ বা ঐচ্ছিক হওয়া চাই। কেউ যদি উচ্চতম ধাপ পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা পেতে চায় তার পথে যেন কোন বাধা না থাকে। তেমনি যে তা পেতে চায় না তাকে জোর করে পড়তে বাধ্য করাও আমার মতে ন্যায়সঙ্গত নয়। অধিকন্তু তা মোটেও সুফলপ্রসূ হবে না। পৃথিবীব্যাপী এখন ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত। আমার বিশ্বাস, ইসলামও ব্যক্তি-স্বাধীনতা অস্বীকার করে না। করলে কোরান শরীফে এমন উক্তি করা হতো না: 'তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার।' এ যুগে কাকেও জোর করে বেহেস্তে পাঠাবার বা নিয়ে যাওয়ার অধিকার কারো নেই।

দেখা গেছে
জন্য অবতীণ

ধর্ম-ভিত্তিক রাজনীতির বিপদ

আমি রাজনীতিবিদ নই, কোন রকম রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আমার নেই। এ কথা ইতিপূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি। তবুও আমি যে-রাজনীতি বা রাজনৈতিক কোন কোন সমস্যা-সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করে থাকি তার কারণ আমি বিশ্বাস করি যখনই দেশের সামনে কিংবা ব্যাপক অর্থে মানুষের সামনে কোন সমস্যা দেখা দেয়, সে সম্বন্ধে ভাবা, চিন্তা করা আর সে-ভাব আর চিন্তাকে দেশ আর মানুষের সামনে তুলে ধরা লেখকের এক প্রধান দায়িত্ব। লেখক সমাজ-বিচ্ছিন্ন নন, সমাজ-বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন না। তাঁর চিন্তা আর ভাব জনগণ গ্রহণ করবে কি করবে না সে স্বতন্ত্র কথা—তা লেখকের বিবেচ্য নয়। লেখকের দায়িত্ব নিজের উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করা। এ না করা মানে নিজের দায়িত্বের প্রতি চোখ বুজে থাকা। আবার প্রচারক নন্ বলে নিজের মতামত কারো উপর চেপে দিতেও তিনি অনিচ্ছুক। তাঁর প্রকাশিত মতামত-সম্বন্ধে পাঠক একটুখানি ভেবে দেখুক এই তাঁর সর্বোচ্চ কামনা। লেখকের একটা ভূমিকা-সম্বন্ধে এই আমার ধারণা, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি দেশের সাম্প্রতিক ঘটনা আর রাজনীতি-সম্বন্ধেও লিখে থাকি। আগেও লিখেছি। এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধেও ইতিপূর্বে আমি-যে একাধিকবার লিখি নি তা নয়; কিন্তু আমার বিশ্বাস বিষয়টি যেভাবে দিন দিন জটিলতর হয়ে উঠছে তাতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা-যে শুধু বিঘ্নিত হবে তা নয়, প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাৎমুখীনতাই পেয়ে যাবে প্রশ্রয়। দেশের অগ্রগতি হবে পদে পদে ব্যাহত। তাই এসব আলোচনা পুনরাবৃত্তির দাবী রাখে। আমার বিশ্বাস, ধর্ম আর রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু—রাজনীতির প্রধান কাজ রাষ্ট্র-পরিচালনা, রাষ্ট্র-পরিচালনায় রাজনীতিকে পদে পদেই আপস করে চলতে হয়, কিন্তু ধর্ম তার সম্পূর্ণ বিপরীত, কোন অবস্থাতেই ধর্ম আপস করতে রাজী না, আপস করতে গেলেই ধর্ম তার খাঁটি রূপ বা অকৃত্রিমতা বজায় রাখতে পারবে না কিছুতেই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে-কোন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান চলে, কিন্তু ধর্মীয়

কোন ব্যাপারেই এ পদ্ধতি অচল। গণ-ভোটে ধর্মীয় বিষয়ের মীমাংসা করা হলে ধর্ম আর ধর্ম থাকবে না। আমরা আমাদের দেশের জন্য গণতন্ত্রকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি (ধর্মীয় দলগুলিও এ চায়), কাজেই আমাদের রাজনীতির চেহারা আর চরিত্র হবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম খাপ খায় না, শুধু গণতান্ত্রিক কেন কোন রাজনীতির সঙ্গেই ধর্ম খাপ খেতে পারে না। রাজনীতি বিশেষ করে আধুনিক রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে সেকুল্যার, কিন্তু ধর্মকে আধুনিক বা অনাধুনিক নামে কিছুতেই চিহ্নিত করা যায় না। ধর্ম চিরন্তন—সে চিরন্তনের সঙ্গে দিনে দিনে পরিবর্তনশীল রাজনীতির নেকাহ্ দিতে গেলে সুখের দাম্পত্য জীবন অকল্পনীয়, আমার আপত্তির প্রধান কারণ এখানে। এবার আমার বক্তব্য নিবেদন করছি।

ইদানীং 'ইসলামী শাসন' কথাটা আমাদের এক শ্রেণীর নেতা আর কর্মীর মুখে খুব একটা জনপ্রিয় তথা লোক-ভুলানো বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে লোক ভুলানো অতি সহজ একারণে যে, এর পেছনে একটা অন্ধ আবেগ রয়েছে, যে-আবেগ বুদ্ধি-দীপ্ত কিংবা বাস্তব-ভিত্তিক নয় মোটেও। দেখা গেছে ধর্মের নামে মানুষ কখনো যুক্তি-বিচারের ধার ধারে না, স্রেফ একটা উত্তেজিত আবেগের স্রোতে যায় ভেসে। আমাদের দেশে যে-সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ধর্ম-ভিত্তিক শাসনের দাবী করা হচ্ছে, আদতে ধর্মের খেদমত বা ধর্ম প্রচার ঐ সব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা। সে ক্ষমতা দখল সহজ হবে মনে করেই এ সব প্রতিষ্ঠান ধর্ম বা 'ইসলাম'কে করে নিয়েছে একমাত্র মূলধন। কারণ এ মূলধনের সাহায্যে ধর্মপ্রাণ জনগণকে সহজেই উত্তেজিত করে তোলা যায়, যায় বিভ্রান্ত করা।

না হয় এসব প্রতিষ্ঠানের নেতারাও জানেন 'ইসলাম' বা অন্য যে-কোন ধর্ম রাজ-নীতির উর্ধ্বে, ধর্ম মোটেও রাজনীতির বিষয় হতে পারে না। বিশেষত ভূগোল-ভিত্তিক যে-রাজনীতি, 'ইসলাম'কে তেমন রাজনীতিতে ব্যবহার করা হলে ইসলামকে খাটোই করা হয়। ধর্ম হিসেবে ইসলাম ভূগোল মানে না, পক্ষান্তরে রাজনীতি শুধু-যে ভূগোল মানে তা নয়, বরং ভৌগোলিক অবস্থান আর প্রয়োজন বোধে রাজনীতি অহরহ রূপ থেকে রূপান্তরে আবর্তিত হতে থাকে। এ কারণে মুসলমানপ্রধান দেশগুলিতেও রাজনীতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে, নিতে বাধ্য হয়েছে। রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, গণতন্ত্র, এমন কি সমাজতন্ত্রও মুসলমানপ্রধান দেশ

ও অঞ্চলে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে এযুগেও। অধিকন্তু ইসলামকে রাজনীতির বিষয় করে তোলা হলে তাতে আঞ্চলিকতার প্রবেশ না ঘটে পারে না, অথচ ইসলাম কোন অর্থেই আঞ্চলিক নয়। ধর্ম হিসেবে ইসলাম এক বিশ্ব-ধর্ম, বিশ্বের তাবৎ মানুষের ধর্ম, যার ইচ্ছা এ ধর্ম গ্রহণ করে, এ ধর্মের বিধিবিধান অনুসরণ করে জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু যে-কোন মুসলমান পাকিস্তানী বনতে পারে না রাতারাতি। রাজনৈতিক বহু আট-ঘাট পার হয়েই তবে তাঁকে হতে হয় পাকিস্তানী। কিন্তু মুসলমান হতে তার এক মিনিটও দেরী লাগে না। ধর্ম আর রাজনীতির ভূমিকা এত আলাদা যে, তা খাঁটি ধার্মিক আর খাঁটি রাজনীতিককে বুঝিয়ে বলার কোন প্রয়োজনই করে না। ডালে-চালে মিশিয়ে খিচুড়ি হয়; কিন্তু ধর্ম আর রাজনীতি মিশিয়ে ধর্মীয় রাজনীতি হয় না। স্রেফ ভাঁওতা দেওয়া চলে শুধু ঐ রাজনীতির নামে। আরো একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র তবুও যে-কোন মুসলমান পাকিস্তানের নাগরিক হতে পারে না। এমন কি বিনা পাসপোর্টে পারে না প্রবেশ করতেও। তা করতে হলে আরো শর্ত পূরণ করা চাই। পাসপোর্টের অভাবে বহু মুসলমান ইসলামের জন্মস্থানে গিয়ে হজ্বের মতো ধর্মীয় কাজও-যে করতে পারে না, তা বোধ করি কারো অজানা নয়। কাজেই, এ এক চক্ষুগ্রাহ্য সত্য যে, ইসলাম এক, মুসলমান অন্য (বলা বাহুল্য রাজনীতিতে অদৃশ্য দিলী কারবারের কোন স্থান নেই)। দেশগত রাজনীতি মুসলমানের জন্য, ইসলামের জন্য তা হতেই পারে না, দেশগত রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে ইসলামকে নিয়ে আসা হলে তা কিছুতেই তার ধর্মীয় অকৃত্রিমতা বজায় রাখতে পারবে না। পাসপোর্ট-ভিসা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার, ভূগোলভিত্তিক আধুনিক রাজনীতিরই এ এক আবিষ্কার। খাঁটি ধর্মীয় বিধানের দিক থেকে দেখলে একে ইসলাম-বিরোধী না বলে উপায় নেই। কারণ ধর্মীয় বিধিবিধানের যেমন, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাৎ ইত্যাদি ব্যাপারে ইসলামে সরকারী বা বেসরকারী নিয়ন্ত্রণের কোন হুকুম নেই বলেই আমার বিশ্বাস। থাকলে তা আলেমদের জানা থাকার কথা। পাকিস্তান নামে ইসলামী রাষ্ট্র হলেও, শাসিত হয় আধুনিক রাষ্ট্রনীতির সাহায্যে। তাই ধর্মীয় বিধিবিধানের কথা কিছুমাত্র আমলে না এনেই, অন্যান্য আধুনিক রাষ্ট্রের মতো পাকিস্তানও পাসপোর্ট ভিসা প্রবর্তন করেছে, করেছে ইসলাম-ধর্মাবলম্বীর জন্যও!

বলেছি ইসলাম আর মুসলমান আলাদা। অন্তত রাজনীতি ক্ষেত্রে তাই। মুসলমানকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা যায় কিন্তু ইসলামকে যায় না। তাই রাজনৈতিক অর্থে ধর্মীয় শাসন কথাটা অর্থহীন। ইংলণ্ডে ইসলামী শাসন নেই কিন্তু বহু মুসলমান আছে, আমেরিকায়ও তাই, ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানেরাই সংখ্যা-প্রধান কিন্তু ইসলামী শাসন নেই। এভাবে অসংখ্য দেশের নাম করা যায় যেখানে 'ইসলামী শাসন' নেই, কিন্তু বহু সৎ ও ধার্মিক মুসলমান রয়েছে। রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে জাগতিক ব্যাপার, ধর্ম তা নয়। রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত সব মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি, সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান। দেশের রাজনৈতিক দলগুলি এর জন্য রচনা করে বিভিন্ন পরিকল্পনা, কর্মসূচী, খসড়া ইত্যাদি। আর চেষ্টা করে সে-সবকে বাস্তবায়িত করতে নিজেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে। এর অনেক কিছুই ধর্মীয় বিধিবিধানের বাইরে। যে-সব ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল এসব বিষয়ে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা অতীতে যেমন তেমনি বর্তমানেও, দেশের সামনে পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এখন সে সব দলই পাকিস্তানের রাজনীতি ক্ষেত্রে 'ইসলাম' আর 'ইসলামী শাসনে'র ধুয়া তুলেছে। আমার মতে ইসলামী শাসন যদি প্রবর্তন করতে হয় তা সর্বাগ্রে করা উচিত ইসলামের জন্মস্থান মক্কা-মদীনায়। আর সেখান থেকে যদি দাবীটা উত্থাপিত হয় তাহলে তা অতি সহজে প্রচারিত হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে পারবে। কারণ সেখানে বিনা দাওয়াতে, বিনা দলীয় খরচে লক্ষ লক্ষ ধর্ম-প্রাণ মুসলমান প্রতি বছর হজ্বের সময় সমবেত হয়ে থাকে। 'ইসলামী শাসনে'র আন্দোলনটা যদি সেখানেই দানা বেঁধে ওঠে, তাহলে ইসলামের মতো 'ইসলামী শাসনে'র দাবীও সূর্যকিরণের মতো সেখান থেকেই দিকে দিকে, দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ার একটা অপূর্ব সুযোগ লাভ করবে আর সেটাই হবে অধিকতর কার্যকরী। ইসলাম যেমন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, তেমনি 'ইসলামী শাসন'ও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার হতে পারে না। অন্তত মুসলমানপ্রধান দেশগুলিতে একে সার্বিক করে তুলতে হলে এর সূচনা ইসলামের জন্মস্থান থেকে হওয়াই উচিত। কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলি আজো তেমন কোন উদ্যোগ নিয়েছেন বলে শুনি নি! আসলে এঁদেরও উদ্দেশ্য 'ইসলামী শাসন' নয়, ইসলামের নাম করে কোন রকমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। কারণ অন্তত দিলে দিলে তাঁরাও জানেন 'ইসলামী শাসন' পাকিস্তানে এককভাবে

কায়েম হতে পারে না। ইসলামের সূচনা যেখানে সেখান থেকে হওয়াই কি অধিকতর স্বাভাবিক নয়? তাহলে বিভিন্ন দেশের মুসলমানেরা, 'ইসলামী শাসন' জনগণের জীবনে কতখানি সুফলপ্রসূ হয়েছে, তা সহজে দেখতে পেতো এবং নিজেদের দেশেও 'ইসলামী শাসনে'র সপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করতো। পাকিস্তান বহু ধর্মাবলম্বীর দেশ, এখানে যথাযথভাবে ধর্মীয় শাসন চালাতে গেলে সঙ্কট অনিবার্য। এমন কি সে সঙ্কটের ফলে দেশের রাজনৈতিক নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হতে পারে। কায়েদে আজমের এ সত্য জানা ছিল, তাই গোড়াতেই তিনি জাতির উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন :

"Now I think we should keep that in front of us as our ideal and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as the citizens of the state." (পাকিস্তান সংবিধান সভায় কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার উদ্বোধনী ভাষণ দ্রষ্টব্য।)

আমাদের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতাদের যদি 'Political sense' বা রাজনৈতিক বোধ থাকতো তাহলে তাঁরা কখনো 'ধর্মীয় শাসনে'র এ অসম্ভব দাবী তুললেন না। 'ধর্মীয় শাসন' আধুনিক রাষ্ট্রে সম্ভবপর হলে কায়েদে আজম নিজেই তার প্রতি স্বীকৃতি জানাতেন। তাঁর চেয়ে বড় রাজনীতিবিদ আর তাঁর চেয়ে বড় মুসলিম নেতা এদেশে আজও জন্মায় নি। "মুসলমান এখন কবরে আর ইসলাম শুধু কেতাবে" উক্তিটা কার সঠিক মনে পড়ছে না। খুব সম্ভব আল্লামা ইকবালের। যাঁরই হোক মনে হয় কথাটা সত্য। খাঁটি মুসলমানরা এখন সব পরলোকে, দেশে তথাকথিত 'ইসলামী শাসন' না থাকা-সত্ত্বেও তাঁরা কোরআন-হাদিস মোতাবেক খাঁটি মুসলমানের মতো জীবন যাপন করে এখন শেষ বিচার দিনের অপেক্ষায় আছেন কবরে শায়িত থেকে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে ঐসব লোকদের নিয়ে যাঁদের ইসলাম কেতাবেই আবদ্ধ, প্রতিদিনের জীবনের অঙ্গ নয়। এঁরা কেতাবী ইসলামকে মস্তিষ্ক দিয়ে গ্রহণ আর হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি না করে স্রেফ মুখের বুলি আর 'শ্লোগানে'র বিষয়

করে নিয়েছেন। এঁরা ইসলামকে ব্যবহার করেন তোতা পাখির মতো। এঁদের জানা উচিত ইসলাম সব মুসলমানের জন্যই কিন্তু রাজনীতি স্রেফ রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক কর্মী আর রাজনীতি-সচেতনদের জন্যই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ধর্ম আর রাজনীতি কখনো এক সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশতে পারে না, জোর করে মেশাতে গেলে দু'য়েরই ক্ষতি অনিবার্য। দু'য়ের স্বভাবে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। ধর্ম মিলনমূলক, মিলনধর্মী, রাজনীতি বিরোধমূলক বা বিরোধ-ধর্মী। ধর্ম মানুষকে এক জমাতে মিলতে বলে এবং মেলায়। রাজনীতি তার বিপরীত। ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে রাজনীতিতেও অস্থায়ী সমঝোতা বা যুক্তফ্রন্ট হয় বটে, কিন্তু সেটাকে কিছুতেই সত্যিকার অর্থে মিলন বা ভ্রাতৃত্ব বন্ধন বলা যায় না, যা ধর্মের ক্ষেত্রে সম্ভব। অধিকন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতি সম্পূর্ণ দলভিত্তিক, এ-রাজনীতি মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে। বিভক্ত করাই এর স্বভাব। এমন কি কর্মসূচী আর লক্ষ্যে এক হলেও রাজনীতি ক্ষেত্রে মিলন ঘটে না। এ কারণে দেখা যায় আমাদের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও বিরোধের অন্ত নেই।

এর বড় কারণ এ সব প্রতিষ্ঠান আর নেতারা 'ইসলামে'র নাম ব্যবহার করে বটে, কিন্তু তাঁদের আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা। আগেই বলেছি রাজনীতি হচ্ছে স্বভাবে বিরোধধর্মী, তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে আলেমে আলেমেও মিল হয় না। দুই মসজিদের ইমামে ইমামে, রাজনীতির প্রভাব-মুক্ত দুই মাদ্রাসার মোদাররেসে মোদাররেসে অতি সহজে মিল হয়ে থাকে, কিন্তু দুই রাজনৈতিক দলের আলেমে আলেমে মিল হওয়া দূরের কথা, বরং একে অপরের বিরুদ্ধে কুফরীর ফতোয়া দিতেও দ্বিধা করে না। ধর্মের ক্ষেত্রে বা ধর্মের নামে রাজনীতি করতে গেলে এ পরিণতি না হয়ে যায় না। রাজনীতির বিরোধধর্মী স্বভাব এভাবে ধর্মীয় নেতাদেরও গ্রাস করে নেয়।

দুধের সঙ্গে পানি বা পানির সঙ্গে দুধ মেশালে যেমন একটা জলো বস্তুই তৈরী হয়, যাতে খাঁটি দুধ বা খাঁটি পানির কোন স্বাদই থাকে না; তেমনি ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি বা রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেশালে সে একই পরিণতি না ঘটে পারে না। তখন ধর্মও যেমন 'জলো' হয়ে পড়বে, তেমনি 'জলো' হয়ে পড়বে রাজনীতিও। ফলে ধর্ম ও রাজনীতির যে আসল উদ্দেশ্য তা হয়ে যাবে ব্যর্থ। রাজনীতির সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য বলে এরকম অবস্থায় সর্বাগ্রে ধর্মই হয় ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষমতার জোরে

বা মোহে তখন রাজনীতিই হয়ে পড়বে সর্বেসর্বা। যেমন খ্রীস্টীয় জগতে হয়েছে। ওখানেও ধর্মের প্রতিভূ চার্চ আর রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বে রাষ্ট্রই হয়েছে জয়ী। কারণ ক্ষমতার মালিক আর নিয়ন্তা হচ্ছে রাষ্ট্র আর পরিচালনা করে রাজনীতিবিদরা। এ ব্যাপারে আমাদের দেশেও ভিন্নতর পরিণতি হওয়ার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করতে গেলে ধর্মকে আপস করতেই হবে পদে পদে। নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যায়ঃ আমাদের দেশে এখন যে-আইন চালু রয়েছে তা-যে কোরান আর সুন্নাহ মোতাবেক রচিত নয় তা সবারই জানা; আর-এও অজানা নয় যে, ইসলামে সুদ দেওয়া নেওয়া শুধু নয়, সুদের হিসেবপত্র লেখাও হারাম। এতৎসত্ত্বেও দেখা যায় আমাদের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির অনেক সদস্য এ আইনের সাহায্যে ব্যবসা করে জীবিকা অর্জন করে থাকেন, অনেকে চাকরি করেন বিভিন্ন ব্যাঙ্কে, যেখানে অহরহ চলছে সুদের লেন-দেন, তবু এসব ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের এসব সদস্যের পদত্যাগের বা ঐসব পেশা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলে শোনা যায় নি এযাবৎ। দিলেও এমন নির্দেশ কেউ মানবে বলেও মনে হয় না। এ সত্য আমার চেয়েও ঐসব প্রতিষ্ঠানের 'আমীর' আর 'নাজিম'রা আরো বেশী করে জানেন। তার চেয়েও তাঁরা বেশী জানেন ঐসব লোক দলত্যাগ করলে বা ওদের বহিষ্কার করা হলে গোটা প্রতিষ্ঠানই হয়ে পড়বে দুর্বল। দুর্বল হয়ে পড়বে রাজনৈতিক অর্থেই না হয় শরিয়ত বরখেলাপকারীদের বাদ দিয়ে একদম খাঁটি শরিয়তপন্থীদের নিয়ে যদি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় তাহলে ধর্মের দিক দিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠান খুবই মজবুত হওয়ার কথা। কিন্তু এঁরা তা করবেন না, কারণ ইসলামের নাম ব্যবহার করলেও খাঁটি ইসলামকে এঁরা যতখানি চান তার চেয়ে অনেক বেশী চান রাজনৈতিক ক্ষমতা। তাই শরিয়তের বরখেলাপ কাজে যাঁরা লিপ্ত তাঁদেরেও নিজেদের প্রতিষ্ঠানের সদস্য করতে ও রাখতে এঁদের ধর্মীয় বিবেকে বাধে না। এভাবে ধর্ম রাজনীতির সঙ্গে আপস করে চলেছে আর এ আপস করা হচ্ছে রাজনীতির সপক্ষে আর ধর্মের প্রতিকূলে। তাই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি স্রেফ ভাঁওতা ছাড়া কিছু না। এ ভাঁওতার ফলে ধর্মই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। কারণ এদের হাতে পড়ে দিন দিন ধর্ম হারাচ্ছে তার আসল স্বরূপ। তাই খাঁটি ধার্মিকদের যাঁরা সত্যি সত্যি ধর্মকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন তাঁদের সাবধান হওয়া উচিত। অন্যদিকে রাজনীতিও যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না তা নয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্মকে

টেনে আনায় দেশের রাজনীতিও রীতিমতো ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। ধর্ম আর রাজনীতির ভূমিকা-যে সম্পূর্ণ আলাদা, এ জ্ঞান জনসাধারণের থাকার কথা নয়। ফলে অতি সহজে এঁরা ঘোলাটে জলের মাছ হয়ে পড়ে, তখন ভাঁওতাবাজরাই পেয়ে যায় শিকারের এক অপূর্ব সুযোগ। তাই খাঁটি ধার্মিকের মতো খাঁটি রাজনীতিবিদদেরও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি-সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকা উচিত। এঁদের হাতে ধর্ম যেমন কিছুতেই নির্ভেজাল খাঁটি থাকবে না, তেমনি এঁদের খপ্পরে পড়ে রাজনীতিও সুষ্ঠু আর সুস্থভাবে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পথ ধরে পারবে না গড়ে উঠতে। দেশের রাজনীতি সব সময় থেকে যাবে ঘোলাটে। এ অবস্থায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আরো দীর্ঘকাল থেকে যাবে জনগণের নাগালের বাইরে। ধর্ম নিজে গণতান্ত্রিক নয় বলে ধর্মীয় মাল-মসলা দিয়ে কিছুতেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয়-সৌধ গড়া যেতে পারে না। এও স্মরণীয়, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি পাকিস্তানের বাইরের মুসলমানের জন্যও এক বড় রকমের বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। মুসলমান শুধু পাকিস্তানে বাস করে না, পৃথিবীর বহু দেশেই মুসলমান ছড়িয়ে আছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানরা সংখ্যালঘু। ভারতের পঞ্চাশ কোটি লোকের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা নাকি প্রায় পাঁচ কোটির মতো। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র যদি ভালো হয় তাহলে তা-যে সব দেশ, সব জাতির জন্যই ভালো তা না মেনে উপায় নেই। আমাদের তেমন 'ভালো' নজিরটা যদি ভারতও গ্রহণ করে অর্থাৎ তারাও যদি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে তাহলে ওখানকার মুসলমানের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? স্বভাবতই ওরাও আমাদের মতো লোকসংখ্যার সংখ্যাপ্রধান অংশের ধর্মের ভিত্তিতেই তাদের রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে চাইবে। আমাদের ধর্ম আর সংস্কৃতি যেমন তৌহিদ-ভিত্তিক, ওদের ধর্ম ও সংস্কৃতি তেমনি প্রতিমাভিত্তিক। এ উভয় ধারণার মধ্যে শুধু-যে ব্যবধান রয়েছে তা নয়, বরং রয়েছে প্রচণ্ডতম বিরোধ। শিক্ষিত হিন্দু সমাজের আচার-বিচার আর বিশ্বাস এখন যাই হোক না কেন, হিন্দু ধর্ম আর সংস্কৃতিক সাথে প্রতিমার-যে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। এ সবই ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী। যে-ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে গড়ে তোলা হবে সে ধর্মের বিধিবিধান, আচার-বিচার, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে শিক্ষা-দীক্ষা আর সমাজ-জীবনেও প্রতিফলিত হবে। না হয়ে পারে না। ভারত আর পাকিস্তান

নিকটতম প্রতিবেশী। এ অবস্থায় একের প্রভাব অন্যের উপর পড়বে না, এ ভাবা যায় না। বলা বাহুল্য, ধর্মীয় আবেগও কলেরা-বসন্তের চেয়ে কম ছোঁয়াচে নয়। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র যদি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেও একদল যে ঐরকম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে-পড়ে লাগবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তখন পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষের ধর্মীয় আর সাংস্কৃতিক প্লাবনে পাঁচ কোটির ধর্মীয় আর সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের যদি বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন মামুলী প্রতিবাদ করার মুখও তো থাকবে না আমাদের। এখানেও অনুরূপভাবে সংখ্যালঘুর সাংস্কৃতিক জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা-যে দেখা দেবে না তা নয়। সর্বত্রই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তথা রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধানতম শিকার হবে সংখ্যালঘুরাই। দৈহিক অর্থে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন না হলেও ধর্মীয় আর সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়ে পারে না। মুসলমানরা যত দেশে সংখ্যাপ্রধান সে তুলনায় অনেক বেশী-সংখ্যক দেশে তারা সংখ্যালঘু। তাই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মুসলমানেরই ক্ষতির কারণ হবে সবচেয়ে বেশী। ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও বর্ণ-ভিত্তিক রাজনীতিরই দোসর—এ রাজনীতি মানুষকে মেলায় না, বিভক্ত করে, মানুষকে বন্ধু করে না, বরং বন্ধুকে শত্রু বানায়। পাকিস্তানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রশ্রয় পেলে তা বহু দেশের মুসলমানের জন্যও এক অকারণ বিপদ ডেকে আনবে।

একটি অশুভ লক্ষণ

"I may disapprove of what you say, but I shall defend to the death your right to say it."—Voltaire.

প্রায় দু'শ বছর আগে ভল্টেয়ার উদ্ধৃত কথাগুলি বলেছিলেন। এ দু'শ বছরে মানুষের চিন্তাজগতে ঘটেছে অকল্পনীয় ওলটপালট। বহুযুগের লালিত অনেক বিশ্বাস আর প্রত্যয় ভেঙে হয়েছে চুরমার। এমন কি ধর্মীয় বিশ্বাসও নেই অবিচলিত কোথাও। ক্রমাগতই ভেতরে বাইরে মানুষের রূপান্তর এক নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ রূপান্তরের জন্য দায়ী আকল বা বুদ্ধি তথা বিচার করে দেখার শক্তি। বুদ্ধি চির গতিশীল আর স্বয়ংক্রিয়—বলা যায় তা এক রকম ছাই-চাপা আগুন, সুযোগের হাওয়া লাগলে তো কথাই নেই, এমন কি সে হাওয়া না লাগলেও তা জ্বলে ওঠে। জ্বলে ওঠাই তার ধর্ম। আলোকের অভিসারে বুদ্ধিই মানুষের একমাত্র দিশারী। এ বুদ্ধি আর বিচারের সাহায্যেই মানুষ এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মকর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান এসবই তার ফলশ্রুতি। নিজের বিচারবুদ্ধিকে না খাটিয়ে শুধু অন্ধ-বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকলে এসবের উদ্ভব কিংবা বিকাশ কিছুতেই সম্ভব হতো না। তখন আমরা থাকতাম আজো বাবা আদম আর মা হাওয়ার যুগে। আদিম জঙ্গল জীবন পেরিয়ে মানুষের এই-যে উত্তরণ তা স্রেফ স্বাধীন চিন্তা আর বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এমন কি ধর্মের ক্ষেত্রেও কঠোরতম বিধি-নিষেধ এ পরিবর্তন ঠেকাতে পারে নি। বাবা আদমের ধর্ম আজ কোথাও আদিম স্বরূপে অক্ষত অবস্থায় নেই। ইসলাম সর্বাধুনিক ধর্ম হয়েও বিচার আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার হাত এড়াতে পারে নি। শুধু-যে অমুসলমান পণ্ডিত আর গবেষকরা এ বিচার বিশ্লেষণের দায়িত্ব নিয়েছেন তা নয়, মুসলমান পণ্ডিতরাও এ করা থেকে থাকে নি কোনদিন বিরত। কারণ তারাও আকল বা বুদ্ধির অধিকারী। ফলে শাস্ত্র বা শরিয়তের বিচিত্র ভাষ্য আর ব্যাখ্যাই-যে শুধু রচিত হয়েছে তা নয়, এ ভাষ্য আর ব্যাখ্যার পথ ধরে ইসলামেও বিভিন্ন সম্প্রদায় বা মজহারের হয়েছে

উৎপত্তি। ধর্ম ব্যাপারে এরা-যে পরস্পর-বিরোধী মতামত পোষণ করে তাতে বোধ করি দ্বিমত নেই। স্বাধীন চিন্তা আর তা প্রকাশের পথ রুদ্ধ হলে, কোরআন হাদীসের বাইরে বিরাট ও বিচিত্র ইসলামী ধর্ম ও দর্শন সাহিত্য মোটেও গড়ে উঠতো না। স্বাধীন চিন্তা-বিরোধীরা হয়তো বলবেন এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হতো না মোটেও, তখন সব মুসলমান একমত, এক বিশ্বাস আর এক আচরণে তথা এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে থাকতো আবদ্ধ হয়ে, থাকতো না ইসলামে এত ফের্কা, এত মজহাব আর এত সম্প্রদায়। ধরে নিলাম এ যদি সম্ভবও হতো তাহলে ইসলাম ধর্ম হিসেবে হয়তো অবিকৃত, অক্ষত আর আদিম স্বরূপেই থেকে যেতো আর এও না হয় ধরে নিলাম এ ধর্ম পৃথিবীর তাবৎ মানুষ গ্রহণ করে বিশ্বময় এক ও অদ্বিতীয় ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ গঠন করতে সক্ষম হতো। দুনিয়ায় ইসলাম ছাড়া তখন আর কোন ধর্ম রইল না আর মুসলমান ছাড়া রইলো না অন্য কোন মানুষ। সে সঙ্গে দুনিয়া থেকে স্বাধীন চিন্তাকেও দেওয়া হলো নির্বাসন যা সব মতবিরোধের মূল। তাহলে মানুষ আর দুনিয়ার অবস্থা কি ভালো হতো কিছু মাত্র? কোন রকম বিচারবুদ্ধি না খাটিয়ে স্রেফ অন্ধভাবে ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালন করে গেলেই-যে মানুষ সর্বতোভাবে উন্নত মানুষে পরিণত হতো তা ভাবা যায় না। দুনিয়া যদি স্রেফ শাস্ত্রনিষ্ঠ 'ধার্মিকে' ভরে যায় তা হলে তা-যে খুব সুখের স্থান হবে তা মনে করারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। এখন দিকে দিকে, দেশে বিদেশে আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, যাকে সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান কারিগরি প্রকৌশল ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হচ্ছে, যা সব সভ্যতারই মাল মশলা আর বুনিয়াদ, এর কোনটাই স্বাধীন চিন্তা-বিরোধী তথাকথিত 'শাস্ত্রনিষ্ঠ ধার্মিকে'র অবদান নয়। দ্রুত আর স্বল্প শ্রমে হজ্ব করে পুণ্যার্জনের সহায়ক যে-হাওয়াই জাহাজ, বহু ধার্মিকের নিত্যসঙ্গী বৈদ্যুতিক পাখা, অবসর-বিনোদনের সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, এমন কি তাবিজ দোওয়াও এখন যে-ঝরণা কলমে লেখা হয় তাও কোন 'শাস্ত্রনিষ্ঠ পরহেজগার' মানুষের আবিষ্কার একথা জানতে আমার আজো বাকী আছে। মুসলমানরাও এযাবৎ যা কিছু আবিষ্কার করেছে তাও স্বাধীন চিন্তা-চর্চারই ফল। মুসলিম সভ্যতা বলতে যা কিছু বোঝায় তাও গড়ে উঠেছে স্বাধীন চিন্তার পথ বেয়েই। এমন কি যে-সব কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকদের নিয়ে আমরা গৌরব বোধ করে থাকি তারাও স্বাধীন আর মুক্তমনেরই ফসল। ধর্ম-জীবন

মন্দ বা অবাঞ্ছিত তেমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছি ধর্ম-জীবনের সঙ্গে স্বাধীন চিন্তার যোগাযোগ না হলে পৃথিবী সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার পর যে-অবস্থায় ছিল, আজও সেই অবস্থায় থেকে যেত। কোন রকম আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন না করে বরং আরো এগিয়ে গিয়ে বলা যায়, কেতাবী কি অ-কেতাবী কোন রকম ধর্মে বিশ্বাস না করেও মানুষ এ মর্ত জীবনে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে তার দেদার দৃষ্টান্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। পক্ষান্তরে কেতাবী ধর্মে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ধর্মীয় বিধিবিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করেও মানুষ-যে কতখানি দুঃখ দুর্গতি আর হৃতশ্রী জীবন যাপন করছে আমাদের চারদিকে তার নজিরের অভাব নেই। বরং সে নজির এত বেশী আর এত বেদনাদায়ক যে, সংবেদনশীল মানুষমাত্রই এ দৃশ্য দেখে ব্যথিত না হয়ে পারে না। প্রথমোক্তরা বরং নানাভাবে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে আর শেষোক্তদের অবদানের ঘর রয়ে গেছে আজো ফাঁকা, অনেকখানি শূন্য। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করা আর না করার এ পার্থক্য। বলা বাহুল্য, পারলৌকিক জীবন আমার আলোচ্য বিষয় নয়। সেখানকার আশাতিরিক্ত সুখ-সমৃদ্ধির সম্ভাবনা এ জীবনের কোন সমস্যারই সমাধান করে না। তাই ঐ জীবনকে জাগতিক সবরকম আলোচনা-সমালোচনার বাইরে রাখাই সঙ্গত।

যদি বলা হয়, শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই স্বাধীন চিন্তার নিষেধ অন্য ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তায় আপত্তি নেই। তাহলেও মুস্কিল-আসান হয় না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সঙ্কট আর অচলাবস্থার হাত তখনো এড়ানো যাবে না। এমন কি তেমন অবস্থায় ধর্ম আর স্বাধীন চিন্তা দু'য়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে পুরোপুরি। উদাহরণত বলা যায় মানব-উৎপত্তি-সম্বন্ধে সব সেমিটিক ধর্মগ্রন্থই প্রায় একমত। আদম হাওয়া-সম্বন্ধে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিরোধ নেই কোরআন আর বাইবেলে। বলা বাহুল্য ইসলামের মতো খ্রীস্ট ধর্মও সেমিটিক জাতিরই অবদান। আদম হাওয়ার কাহিনী বর্ণনায় কোরআন আর বাইবেলের ইতর বিশেষ যদি কিছু থাকে তা আছে স্রেফ প্রকাশের আঙ্গিকে আর ভিন্নতর প্রতীকের ব্যবহারে। না হয় আসল বক্তব্য এক ও অভিন্ন অর্থাৎ আদম হাওয়াই আদি মানব-মানবী আর তাঁদের থেকেই তাবৎ মানববংশের উৎপত্তি।

আমাদের মতো এ বিশ্বাস খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বী ডারুইনেরও আজন্মলব্ধ। এ জন্মলব্ধ বিশ্বাসকেই যদি তিনি সারাজীবন আঁকড়ে ধরে থাকতেন অথবা ভিন্নতর মত

প্রকাশের স্বাধীনতা যদি তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁকে না দিতো অর্থাৎ ধর্ম-বিশ্বাসের বিপরীত খাতে প্রবাহিত হতে তাঁর মননশীলতা ও গবেষণা যদি বাধা পেতো তা হলে বিবর্তনবাদের মতো এমন যুগান্তকারী থিওরি আবিষ্কার তাঁর দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হতো না। এ আবিষ্কার বিজ্ঞানের রাজ্যে কতদিকে কত পথ-যে খুলে দিয়েছে তা বিজ্ঞানের মুসলমান ছাত্রদেরও অজানা নয়। নিউটন যদি তাঁর বিদ্যা আর বিশ্বাসকে স্রেফ ধর্মগ্রন্থে সীমিত করে রাখতেন তাহলে তাঁর পক্ষে নিউটন হওয়া কিছুতেই সম্ভব হতো না। উড্ডীয়মান সব যন্ত্রের মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে যে-নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা বোধ করি অবৈজ্ঞানিকদেরও অজানা নয়। ফ্রয়েড মানুষের অবচেতন মনের যে-রহস্য সন্ধানে জীবনপাত করেছেন তার সঙ্গে তাঁর ধর্মগ্রন্থের মোটেও মিল নেই। কার্ল মার্কস্ মানুষের চিন্তা আর কর্মজগতে যে-অকল্পনীয় বিপ্লব এনে দিয়েছেন তার সঙ্গে তাঁর ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থের রীতিমতো অহি-নকুল সম্বন্ধ। বলা বহুল্য বিরাট কোন মতবাদ বা থিওরি-বিশেষকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিলেই তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতা, ব্যবহারিক প্রয়োগ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারাই তার সত্যাসত্য নির্ণীত হয়। ডারুইন, নিউটন, ফ্রয়েড কিংবা কার্ল মার্কস্—এঁদেরও এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, হচ্ছে—এ যাচাইয়ের পথেই তাঁদের মতবাদ বা থিওরির আয়ু পুরোপুরি নির্ভর করছে। কালক্রমে এসব থিওরি মিথ্যা বা ভুল প্রমাণিত হলেও তাঁদের চিন্তা আর গবেষণা কিছুমাত্র মূল্যহীন হয়ে পড়ে না। তাঁরা চিন্তা করেছেন আর শাস্ত্র-গ্রন্থের বাইরে স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারিত করে দিয়েছেন। তাঁদের এ সাধনার মূল্য কোনদিন অস্বীকৃত হবে না। কারণ শতবার ব্যর্থ হলেও মানব-মনীষার এই পথ। জীবন সংগ্রাম, জীবনের উর্দ্ধতন আর বিকাশে স্বাধীন চিন্তাই তার একমাত্র হাতিয়ার—উন্নত আর বিকশিত মানুষ হিসেবে বাঁচার জন্য তার যা কিছু প্রয়োজন একমাত্র স্বাধীন চিন্তাই তা যোগাতে পারে। এযাবৎ যুগিয়ে এসেছে। দেখা গেছে স্বাধীন চিন্তার যাঁরা বিরোধী, অভিসন্ধিমূলক হেতুতে যাঁরা স্বাধীন মতামত বা চিন্তার বিরুদ্ধে আন্দোলন আর প্রতিবাদে মুখর হয়ে থাকেন তাঁরাও প্রয়োজন হলে স্বাধীন চিন্তাজাত সুখসুবিধা আর তার ফলগ্রহণে মোটেও নারাজ নন্। সম্প্রতি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে জমাতে ইসলামীপ্রধান চিকিৎসার জন্য লণ্ডনে গিয়েছেন, ইসলামের সুতিকা-গৃহ পবিত্র মক্কা মদিনায় যান নি। লণ্ডনে যাঁরা

তাঁর চিকিৎসা করবেন তাঁরা 'ইসলামী শরিয়ৎ'-অনুসারী এ মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তাঁরা যে-জ্ঞানের সাহায্যে তাঁর চিকিৎসা করবেন বা যে-অস্ত্রাদি দিয়ে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করবেন তাও আমার বিশ্বাস স্বাধীন চিন্তার সাহায্যেই অর্জিত আর ঐ পথেই আবিষ্কৃত। বাইবেল বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে এর কোনটাই হয় নি আয়ত্ত। সমস্ত জ্ঞান আর বিশ্বাসকে যদি ঐ সব ইংরেজ ডাক্তারেরা শুধু ধর্মশাস্ত্রেই সীমিত করে রাখতেন তাহলে স্বাধীন চিন্তায় অবিশ্বাসীরাও এভাবে ঐ সব বে-দীন্ নাছারাদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হতেন না।

কিছুদিন আগে এক টাই-বাঁধা আর প্যান্ট্ বা হাফ্ প্যান্ট্-পরা মাথায় কোন রকম টুপি ছাড়া এক বালকের ছবি কাগজে ছাপা হয়েছিল। ছেলেটি কোন এক ক্যাডেট কলেজের কৃতী ছাত্র। পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল: ছেলেটি নেজামে ইসলাম পার্টির অন্যতম দিকপাল এক এডভোকেটের পুত্র। আমার বিশ্বাস টাই আর প্যান্টও স্বাধীন চিন্তার সাহায্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে, কোন শাস্ত্রবিধান এসবের মূল বা উৎস নয়। ফটো ছাড়া বিদেশে যাওয়া যায় না, কাগজে নিজের কিংবা নিজের পুত্র-কন্যার চেহারা যায় না প্রকাশ করা, এমন কি এখন যায় না হজ্বের মতো ধর্মীয় বিধান পালন করাও—কিন্তু আমরা জানি ফটো যন্ত্রটাও কোন 'শরিয়ত-পন্থী'র আবিষ্কার নয়। এটাও স্বাধীন চিন্তারই আর একটি ফসল। স্বাধীন চিন্তাবিরোধীরাও দিন দিন কি ভাবে স্বাধীন চিন্তার হাতে পরাজিত হচ্ছেন এসব তার সাম্প্রতিক নজির।

যে-ছেলেটির কথা উপরে উল্লেখ করলাম তাকে লুঙ্গি বা পাজামা আর কোর্তা পরিয়ে মাথায় যে-কোন রকমের একটা টুপি দিয়ে যদি ছবি তোলা হতো তাহলে তা-যে অনেক বেশী 'মুসলমানী' দেখাতো তাতে বোধ করি কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তখন ছেলেটিকে হয়তো এমন স্মার্ট, ফিটফাট্ আর সুন্দর-যে দেখাতো না একথা আমাদের চেয়েও মনে হয় ছেলের বাবা অনেক বেশী জানেন। বেশী জানেন বলেই যেখানে ইসলামী শরিয়ত ভালো করে শিক্ষা দেওয়া হয় আর ইসলামী আচার-আচরণের জন্য দেওয়া হয় তাগিদ তেমন কোন মাদ্রাসায় তিনি ছেলেকে ভরতি করান নি, করিয়েছেন ক্যাডেট কলেজে। বলা বাহুল্য ক্যাডেট কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা সর্বতোভাবে আধুনিক। এখানে উক্ত ছেলের বাবা গোঁড়া শরিয়ত-পন্থী হয়েও সম্পূর্ণভাবে আমাদের দলে ভিড়ে পড়েছেন। আমাদের

মানে আধুনিকতা আর চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসীদের দলে। আধুনিকতার জয় এভাবেই ঘটে থাকে। চিরকাল এভাবেই ঘটে এসেছে। ভবিষ্যতেও এভাবেই ঘটবে।

যদি বলা হয় স্বাধীন চিন্তা স্রেফ ধর্মের বেলায় অচল, তাও ধোপে টেকে না— তার দৃষ্টান্ত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানের বেলায় এ আরো বেশী অচল। কারণ বলা হয়ে থাকে মুসলমানের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামী বিধি-বিধানের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এ অবস্থায় স্বাধীন চিন্তা-বিরোধীরা স্ববিরোধিতার শিকার না হয়ে যায় না। স্ববিরোধিতারই তো এক নাম মোনাফেকি। যার নিন্দা কোরআনে বার বার করা হয়েছে। এখন যে-ধরনের নাচ গান চলে, সিনেমা বায়োস্কোপ আর টেলিভিশনে (বেগানা) মেয়েদের যে-ভাবে দেখানো হয় তা কি শরিয়তের দ্বারা সমর্থিত? অথচ এসবের বিরুদ্ধে আজো তো কোন মিছিল বার হয়েছে বা হরতাল ঘোষিত হয়েছে বলে শুনি নি। নেজামে ইসলাম আর জমাতে ইসলামের সমর্থকদের মধ্যে অনেক কৃতী ব্যারিস্টার, অ্যাডভোকেট ইত্যাদি রয়েছেন, তাঁরা আইন ব্যবসা করে থাকেন সাফল্যের সাথে, জিজ্ঞাসা করি, দেশে এখন যে-আইন প্রচলিত সে সব আইনের সাহায্যে ইসলামিক রিপাব্লিক অব পাকিস্তান আর তার জনগণ শাসিত হচ্ছে, তা কি কোরআন হাদিস-অনুসারে রচিত? এসব আইনের সাহায্যে তাঁরা কি জীবিকা অর্জন করছেন না? এসব আইনের উৎস কি কোন 'অবতীর্ণ' ধর্মগ্রন্থ না মানুষের স্বাধীন চিন্তা? নিঃসন্দেহে এ-ও স্বাধীন চিন্তারই ফসল।

ধর্মের নামে নাম রাখা হলেও নেজামে ইসলাম আর জমাতে ইসলাম ধর্মপ্রচার করেন না। এ দু'দলও পুরোপুরি রাজনীতিই করে থাকে—দু'দলেই আছেন ঝুনো রাজনীতিবিদ। অন্যান্য দলের মতো তারাও গণতন্ত্রই চান পাকিস্তানের জন্য এবং তার জন্য করে থাকেন আন্দোলনও। যে-গণতন্ত্রের দাবী তাঁরা করেন, যার চেহারা হুবহু আমরা দেখতে পাই তাঁদের প্রকাশিত বক্তৃতা, ইস্তাহার আর বিবৃতি ইত্যাদিতে, তার সঙ্গে য়ুরোপীয় গণতন্ত্রের তেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ঐ গণতন্ত্র তো সর্বতোভাবে স্বাধীন চিন্তা আর তার পরীক্ষা-নিরীক্ষারই ফল। কোন ধর্মগ্রন্থই তার উৎস নয়। তাঁরা বা আমরা পাকিস্তানের জন্য যে-গণতন্ত্রের কথা এখন বলছি বা

যে-শাসনতন্ত্র এখন পাকিস্তানে চলছে তার স্বরূপ কোরআন হাদিসে কোথাও বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইসলামের জন্মস্থান আরব দেশগুলিতে এখন যে-শাসনতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে তাও কি কোরআন হাদিস মোতাবেক?

সব গণতন্ত্রই স্বাধীন চিন্তার ফল—স্বাধীন চিন্তা না থাকলে গণতন্ত্রের আদৌ উদ্ভব হতো কি না সন্দেহ। কোন ধর্মগ্রন্থই গণতন্ত্রের জনক বা জননী নয়। ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য মানুষের আধ্যাত্মিক আর চারিত্রিক উন্নতি সাধন আর তাকে সৎ জীবনের পথ দেখানো। সে ধর্মকে প্রতিটি জাগতিক ব্যাপারে টেনে এনে স্বাধীন চিন্তার পথ রোধ করা হলে স্ববিরোধিতা তথা আত্মপ্রবঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। স্বাধীন আর মুক্ত চিন্তার কথা আমি ইতিপূর্বেও বহু বার বলেছি, সে একই প্রসঙ্গে আবারো ফিরে আসার কারণ, সম্প্রতি ডঃ ফজলুর রহমান-নামক এক পণ্ডিত গবেষকের একটা বইকে কেন্দ্র করে আমাদের এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক যে-ভাবে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করেছে ও করছে তা দেখে আমরা যারা স্বাধীন চিন্তা আর তার প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তারা রীতিমতো শঙ্কিত বোধ না করে পারি না। আমার বিশ্বাস এধরনের উত্তেজনা-সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হলে দেশের মননশীলতার মূলেই কুঠারাঘাত হানা হবে। তখন আমাদের সব চিন্তা আর মননশীল ক্রিয়া কর্ম হয়ে পড়বে স্রেফ খাঁচার পাখি। বলা বাহুল্য প্রচলিত মত আর বিশ্বাসের চর্বিত-চর্বণের নাম রিসার্চ বা গবেষণা নয়। গবেষণা নতুন সত্যের সন্ধান দেয় বলেই তার যা কিছু মূল্য।

তা না হলে অত শ্রম, অত শক্তি আর অতখানি অর্থব্যয়ের কোন মানে হয় না। গবেষকরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণা করে থাকেন, গবেষণার এই চিরন্তন নিয়ম। ডক্টর ফজলুর রহমান ইসলামী গবেষণাকেন্দ্রের ডিরেক্টর ছিলেন, স্বভাবতই ইসলাম আর ইসলাম-সম্পর্কিত বিষয়ই হয়েছে তাঁর গবেষণার বিষয়। তিনি তাঁর এ গবেষণার পথে সাধারণের বা প্রচলিত মত ও বিশ্বাসের বিপরীত কোন সত্যের সন্ধান যদি পেয়ে থাকেন অথবা তাঁর জ্ঞান বিশ্বাস আর বুদ্ধি বিচারের সাহায্যে তেমন ভিন্নতর সিদ্ধান্তে যদি তিনি পৌঁছেন, তা প্রকাশ করার অধিকার তাঁর থাকবে না কেন? এবং তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা কোথায়? জ্ঞান আর গবেষণার ক্ষেত্রে বাদ-প্রতিবাদ কোন নতুন কিছু নয়। এক গবেষকের মতামত অন্য গবেষক চিরকাল ধরেই খণ্ডন করেন বা করতে চেষ্টা করেন। এখানেও বিপরীত

মতাবলম্বীরা তা করতে পারতেন এবং তা করলেই তাঁরা অধিকতর শালীনতার পরিচয় দিতেন। ডক্টর ফজলুর রহমানের একটা বইএর জবাবে তাঁরা দশটা বই লেখেন না কেন? তাঁদের মধ্যেও তো বিদ্বান আর পণ্ডিত লোকের অভাব নেই। কাগজে বিবৃতি দেওয়া, মিছিল বার করা কিংবা হরতাল ঘোষণা করা অতি সহজ কাজ, একটা বই কি প্রবন্ধ লিখতে যে-বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে হয়, যে-শ্রম স্বীকার করতে হয় ঐ সবে তার শতাংশও লাগে না। ধর্মের একটা ধুয়া তুলে দিয়ে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা এমন কোন কঠিন কাজ নয়, কঠিন হচ্ছে চিন্তা দিয়ে চিন্তা খণ্ডন করা, পাণ্ডিত্য দিয়ে পাণ্ডিত্যের মোকাবেলা করা, বই-এর জবাবে বই লেখা।

আমরা মুখে বলে থাকি 'ইসলামে জোরজবরদস্তি নেই' 'তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার'—ইসলামের এসব নির্দেশের উল্লেখ করে আমাদের ধর্মের উদারতা ও সহিষ্ণুতা নিয়ে আমরা অনেক সময় গর্ব করেও থাকি। অথচ এ বিংশ শতাব্দীতেও আমরা আমাদের একজন স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতের ভিন্ন মত বরদাস্ত করতে রাজি নই। পদত্যাগ করেও নাকি ডঃ ফজলুর রহমানের রেহাই নেই। দাবী করা হচ্ছে তাঁর দণ্ড চাই, তাঁর বই বাজেয়াপ্ত করা চাই, দাবীও নাকি উঠেছে। এরই নাম কি সহিষ্ণুতা? উদারতা? কোরআনের অনুকরণে আমাদের এসব ধর্মপ্রাণ ভাইয়েরা তো ডক্টর ফজলুর রহমানকে একথা কয়টি শুনিয়ে দিতে পারতেন, 'তোমার মতামত তোমার, আমাদের মতামত আমাদের'। তারপর তাঁকে ভুলে গেলে কি উপেক্ষা করে গেলেই তাঁদের কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হতো না। তিনি তো তাঁর মতামত কারো উপর জোর করে আরোপ করেন নি। চান নি চাপাতে। তিনি স্রেফ তাঁর নিজস্ব মতামতই প্রকাশ করেছেন —তা গ্রহণ করার জন্য কাকেও তো আহ্বান করেন নি। তেমন বাধ্যবাধকতাও নেই কারো। চিন্তা বা মতামতের পথ রুদ্ধ করার চেয়ে দেশের জন্য অধিকতর অশুভ লক্ষণ কল্পনা করা যায় না। মানুষ স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, আর স্বাধীন মতামতের অধিকারী—এ অধিকার নিয়েই সে জন্মায়। এ অধিকারের ফলেই সে অন্য সব প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। না হয় সেও একজাতের প্রাণী বই অন্য কিছু নয়। বিবর্তনের যে-স্তরে মন তথা মানুষের চিন্তাশক্তির উদ্ভব হয়েছে, সভ্যতার সূচনাও সে স্তর থেকেই। স্বাধীন চিন্তা ছাড়া কোন সৃষ্টিধর্মী কাজই হতে পারে না। এ ছাড়া সাহিত্য-শিল্প তো একরকম অসম্ভব বললেই চলে। বলেছি

মানুষও এক রকম প্রাণী আর বিশ্বপ্রকৃতিরই অংশ। তবে মানুষ ভেড়া-জাতীয় প্রাণী নয়। স্বাধীন চিন্তার দ্বার রুদ্ধ হলে পৃথিবী-যে অচিরে ভেড়ার রাজ্যে পরিণত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মননশীলতার ক্ষেত্রে আত্মসন্তুষ্টির চেয়ে মারাত্মক আর কিছুই হতে পারে না। এমন আত্মসন্তুষ্টিকে আলডুস্ হাক্সলি তো পাপ বলেই অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর একথা কয়টিও স্মরণ করা যেতে পারে :

"The human being is, unfortunately, a creature endowed with free-will and if for any reason, individuals do not choose to make it work, even the best organization will not produce the result it was intended to produce."

(*The Perennial Philosophy*, p. 289)

ধর্মের যত মহৎ উদ্দেশ্যই থাকুক মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হলে, সে উদ্দেশ্য কিছুতেই হাসিল হবে না। সব ধর্মেরই কিছু না কিছু মহৎ উদ্দেশ্য আছে, ইসলাম সর্বাধুনিক বলে তার উদ্দেশ্য ও বিধিবিধান অপেক্ষাকৃত আধুনিক হওয়াই স্বাভাবিক, এ কারণে তা আজো আধুনিক জীবনের উপযোগিতা হারায় নি। বলা বাহুল্য আধুনিকতার এক প্রধান লক্ষণ চিন্তার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ যে-কোন জাতির পক্ষে এক চরম অশুভ লক্ষণ।

সাহিত্যের সমস্যা ও সমাধান

এক

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত আইরিশ কবি W. B. Yeats 'popular memory' আর 'ancient imagination'-এর প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ এগুলি দেশের ভূগোল ইতিহাস কিংবদন্তী কেচ্ছা কাহিনী আর রূপকথা উপকথা ইত্যাদি অবলম্বন করে, বংশানুক্রমে জাতির স্মৃতি ও কল্পনায় মিশে ঐতিহ্যের রূপ নিয়ে থাকে, যা কালক্রমে শিল্পীর আবেগ আর প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। Popular memory আর ancient imagination কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা ধর্ম আর লোকাচার-ভিত্তিকও হতে পারে। তবে তার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। দেশ আর দেশের ঐতিহ্য-ভিত্তিক স্মৃতি আর কল্পনার ক্ষেত্র আরো ব্যাপক, সামগ্রিক আর সার্বজনীন। নজরুলের 'বিদ্রোহী' তাঁর 'মোহরম' বা 'ফাতেহা দোয়াজ দহম' থেকে অনেক উচ্চাঙ্গের কবিতা, প্রথমটার কাব্যগত আবেদনও অনেক বেশী আর সার্বজনীন ও ব্যাপকতর। 'বিদ্রোহী' popular memory আর ancient imagination-এর এক চমৎকার সমন্বয়। কোন কোন স্তবক গঠনে ত্রুটি আর ভাবের অসঙ্গতি-সত্ত্বেও এ কবিতার আবেগ আর 'ব্যক্তিত্ব'-যে নির্বিশেষ আর অপ্রতিরোধ্য তাতে সন্দেহ নেই। এ সম্ভব হয়েছে নজরুলের সামনে ভাষা আর বিষয়গত কোন সমস্যা কিংবা দ্বন্দ্বই ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকে ভাষার উপর চলেছে এক উৎপাত। অথচ ভাষা হচ্ছে সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার। যে-আবেগ আর প্রেরণা মহৎ রচনার প্রাণ, যা সাহিত্য-শিল্পীকে রচনায় করে উদ্বুদ্ধ, দেয় আত্মনিবিষ্ট তন্ময়তা তা আজ অনুপস্থিত। দেশ বা জাতির কোন চেহারাই আজ আমাদের মানসপটে ফুটে ওঠে না—ফলে এ সবের জন্য আবেগ আর প্রেরণাও হয়ে পড়েছে অনেকখানি খণ্ডিত আর রুদ্ধগতি। কোথাও দেখা যায় না দেশগত আর জাতিগত আবেগ আর প্রেরণায় কোন ঐক্যবোধ। বাইরে ভিতরে আমরা আজ এক

নৈরাজ্যের শিকার। এ অবস্থাকে কিছুতেই সাহিত্য-শিল্পের অনুকূল পরিবেশ বলা বলা যায় না। ব্যক্তিগত প্রতিভার বিচ্ছিন্ন আর খুচরো কিছু কিছু ফসল-যে এ অবস্থায়ও ফলে না তা নয়। কিন্তু বৃহত্তম পরিধিতে ব্যাপকতর ছকে মহত্তর সাহিত্যে, যে-সাহিত্যে দেশ আর জাতির জীবন-জিজ্ঞাসা আর আত্মোপলব্ধি রূপায়িত হয়ে ওঠে, যাতে প্রতিফলিত হয় জাতির মন-মানস আর আত্মা, তা কিছুতেই সম্ভব নয় এমন অবস্থায়। যে-কোন বড় সৃষ্টি আর তার সমজদারি বা appreciation-এর জন্য অনুকূল পরিবেশ চাই। অসাধারণ প্রতিভাবানরা হয়তো সব বাধা-বিঘ্ন ডিঙিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেন কিন্তু সাধারণ আর মাঝারী লেখকদের জন্য পরিবেশের আনুকূল্য আর পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্যক। সেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথ আর ক'টা জন্মান? সংখ্যাতীত মাঝারি লেখকরাই পৃথিবীব্যাপী সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে, দিয়েছে বৈচিত্র্য—রক্ষা করেছে সাহিত্য-শিল্পের ধারাবাহিকতা। আমাদেরও এ মাঝারিদের সাধনা আর নিষ্ঠার উপর নির্ভর না করে উপায় নেই। জীবন আর জীবনের সম্বন্ধে যে যে-মতই পোষণ করুক অথবা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা যার যেমনই হোক, দল-মত-নির্বিশেষে সবাইকে লেখার স্বাধীনতা দিতে হবে। এর জন্য সুস্থ, উদার আর সহিষ্ণু রাজনৈতিক পরিবেশ অত্যাবশ্যক। এখন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য লেখকরা কিছুতেই দ্বিধামুক্ত হতে পারছে না।

পাকিস্তান আন্দোলন ও তার অভাবিত সাফল্য কি মাহেন্দ্র মুহূর্তই না নিয়ে এসেছিল আমাদের সামনে। কিন্তু তার সদ্ব্যবহার আমরা করতে পারি নি। সুদীর্ঘ কালের বহু ঝড়-ঝঞ্ঝায় টিকে থাকা একই রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে দু'দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে।

দুই

এই জন্ম-বেদনার বেদীমূলে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে, বাস্তুহারা হয়েছে। অনেকে সর্বহারা হয়ে পথের ভিখারীতে পরিণত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু-সংখ্যক সরু সরু আঙুল-যে ফুলে কলাগাছ হয় নি তা নয়। তবে বৃহত্তম জনসংখ্যার তুলনায় তা অতি নগণ্য। লক্ষ লক্ষ মানুষ সীমান্তের এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে ছিন্নমূল হয়ে ভেসে গেছে, ভেসে এসেছে। দেশ

স্বাধীনতা পেয়েছে, আমরা এক স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকারী হয়েছি এ যেমন অভাবিত আনন্দ উল্লাসের বস্তু তেমনি অগণিত বাস্তুহারার বেদনা-মথিত চোখের জলে দেশের আকাশ বাতাস হয়েছে আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ। সীমান্তের দুই পারেই লাঞ্ছিত মানবতার বহু মর্মন্তুদ দৃশ্যই সাহিত্যিক শিল্পীর চোখের সামনে অভিনীত হয়েছে। মানুষের বেদনাহত চিত্তের এই গভীর সুখ-দুঃখ ও হাসি অশ্রুর বিচিত্র কাহিনীই তো যুগে যুগে মহৎ শিল্পের প্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, এ সব এখনো আমাদের কোন শিল্পীর তুলিতে আঁকা হয় নি, কোন কবির কণ্ঠে সংগীত হয়ে ঝরে পড়ে নি, কোন সাহিত্যিকের লেখনীতে রূপ নেয় নি। আমাদের সাহিত্যিকরা কেউ 'অল কোয়ায়েট' বা 'ঝড়' কি 'নবম তরঙ্গ' লিখতে পারেন নি। অথচ হাতের কাছে চোখের সামনে লেখার যথেষ্ট উপকরণ ছিল। এমনকি 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ারে'র মত একটা জাতীয় সংগীতও আমাদের কবিরা দেশকে দিতে পারে নি। যার সুর ও বাণীরূপ দেশের আপামর জন-চিত্তে বর্ষার বন্যাবেগ সঞ্চার করে দিতে পারে। বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতিকতার আগে জাতীয়তা। জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলার পরই আন্তর্জাতিক সাহিত্যে বিচরণ সহজ ও সম্ভব। যে-মানুষ পুকুরে সাঁতার কাটতে অক্ষম তার পক্ষে সমুদ্র সন্তরণের বুলি না আওড়ানোই ভালো।

তিন

পাকিস্তান আন্দোলন ও তার সাফল্য কি জানি কেন আমাদের প্রতিভাবান সাহিত্যিক শিল্পীদের মন-মানসে কোন নতুন জোয়ার আনতে পারে নি, অন্তরের অন্তস্তলকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় নি কারো, খুলে যায় নি তাদের চোখের সামনে সাহিত্য-শিল্পের কোন নতুন দিগন্ত। স্বাধীনতার অরুণোদয়ে কারো মন-মানস হয় নি মুখর—নতুন আবেগে কারো উদাত্ত কণ্ঠ হয়ে ওঠে নি উচ্ছ্বসিত। কবি-চিত্তের উল্লাস কতখানি উচ্ছ্বসিত ও কলমুখর হতে পারে তার নিদর্শন নজরুলের 'প্রলয়োল্লাস'।

আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের পাকিস্তান আন্দোলনের বেশ কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। নৃতত্ত্ব ও ভৌগোলিক ঐতিহ্যের দিক থেকে ইংরেজ আর আইরিশে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। এসব বিষয়ে ভারতের সঙ্গে আমাদেরও তেমন

কোন পার্থক্য নেই। ইংলণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন না হলে আয়র্লণ্ড চিরকাল সংখ্যালঘু হয়েই থাকত—জাতি হতে পারত না কখনো। সেই যুগেও ইংলণ্ডের হাউস অব্ কমন্সে আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধি ছিল। কিন্তু নিরঙ্কুশ মেজরিটির কাছে সেই প্রতিনিধিত্বের কোন কার্যকর মূল্য ছিল না। গণতান্ত্রিক নিয়মানুসারে তাঁদের চিরকাল মেজরিটির মুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হতো। আমাদেরও অবস্থা ছিল অবিকল তাই। পাকিস্তান না হলে আমাদেরও চিরকাল থাকতে হতো মেজরিটির মুখাপেক্ষী হয়েই। আর থাকতে হতো ভারতের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায় হয়েই—জাতি হতে পারতাম না কখনো আমরা। হতে হলে নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বহু জিনিস ত্যাগ করে বৃহত্তর ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যেতে হতো। তাই স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আয়র্লণ্ডকে যেমন বৃহত্তর ও সর্বগ্রাসী ইংলণ্ডের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন হওয়ার আন্দোলন করতে হয়েছিল, তেমনি আমাদেরও বৃহত্তর ও সর্বগ্রাসী ভারতীয় প্রভুত্বের বাইরে স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পাকিস্তান আন্দোলন না করে উপায় ছিল না।

চার

সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে আইরিশ আন্দোলনের ব্যর্থতা দেখে সেই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বিশ্ববিখ্যাত কবি W. B. Yeats দুঃখ করে লিখেছেন: "Ireland's great moments had passed, and she had filled no roomy vessels with strong sweet wine where we have filled our porcelain jars against the coming winter." ইয়েটস্ স্বয়ং জাত-কবি ও জাতশিল্পী তাই কাকতালীয় সাহিত্যের ফাঁকি তাঁর চোখে ধরা পড়তে দেরি লাগে নি। এই ব্যর্থতার কারণও তিনি নির্দেশ করেছেন: "Immediate victory, immediate utility, became everything..."। এই মনোভাব কখনো সাহিত্য শিল্পের অনুকূল নয়। আমাদের দশাও কি আজ তাই নয়? আমাদের পাকিস্তান আন্দোলন ও তার সাফল্যের great moment হারিয়ে গেছে, সাহিত্যের সুধাভাণ্ডে তা থেকে আমরা কিছুই সঞ্চয় করতে পারি নি—যা দুর্দিনে ও সঙ্কটে আমাদের মন-মানসের পাথেয় হতে পারে। স্বাধীনতার

পর আমরাও কি নগদ লাভ ও সস্তা সুবিধা আদায়ে মেতে উঠি নি? জনসাধারণের মত সাহিত্যিক-শিল্পীদেরও এই কি একমাত্র মোক্ষ হয় নি? শিল্পীর জন্য cause বড় কথা নয়, cause-কে কেন্দ্র করে যে-জীবন আবর্তিত হচ্ছে, সেই নগ্ন জীবন আর তার সুখদুঃখই শিল্পীর উপজীব্য। "Life is greater than the cause...and artistes are the servants not of any cause but of more naked life and above all of that is its nobler forms where joy and sorrow are one." *Artificers of the Great Moment*...(W. B. Yeats). পাকিস্তান আন্দোলন সেই দুর্লভ great moment অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের জীবনে নিয়ে এসেছিল কিন্তু সস্তা নগদ লাভের প্রলোভনে দিশেহারা হয়ে আমরা সেই moment-এর সদ্ব্যবহার করতে পারি নি।

পাঁচ

এখন আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও সাহিত্যের যে-অবস্থা ও পরিবেশ তাতে শিল্পীর পক্ষে আত্মস্থ হওয়ার সুযোগ-সুবিধা নেই বললেই চলে। এ-অবস্থায় যে-কোন great moment হারিয়ে যাওয়ারই কথা। জীবিকার প্রাথমিক স্বাধীনতাটুকুও যদি না থাকে শিল্পী আত্মস্থ হবেন কি করে? কি করে হবেন বেপরোয়া? সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে শেলী বায়রনের দৃষ্টান্ত টেনে আনার দরকার নেই; বাংলা সাহিত্যেও সেই দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র অভাব নেই। বলা বাহুল্য জাতশিল্পী মাত্রই বেপরোয়া। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল সবাই শিল্পীর এই recklesness তথা বেপরোয়া মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তার জন্য দুঃখ এঁরা পেয়েছেন, বিশেষ করে মধুসূদন ও নজরুল। কিন্তু বেপরোয়া জীবনের যে-স্বর্গ-স্বাদ তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন নি। ব্যবহারিক জীবনে বেপরোয়া হওয়া হয়তো বড় কথা নয়—বড় কথা ভাবে, কল্পনায় কল্প-বস্তু গ্রহণে ও নির্মাণে বেপরোয়া হওয়ার সাহস ও অধিকার—সব বড় শিল্পীরই এই এক বড় গুণ ও এক বড় সম্পদ। বেপরোয়া হওয়ার স্বাধীনতা ছিল বলেই তো মধুসূদনের পক্ষে অমন করে রাবণচরিত্র আঁকা সম্ভব হয়েছে—যা চরিত্র হিসেবে দেবতুল্য রামকেও ম্লান করে দিয়েছে। আর সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যই তো এক জাগ্রত চিত্ত-শিল্পীর বেপরোয়া

বিবেকেরই নিদর্শন। আজকের দিনে 'বিসর্জন', 'চোখের বালি' বা 'ঘরে বাইরে', সেদিন যে-কতখানি দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল তা হয়তো অনেকেই অনুমান করতে পারবে না। উগ্র স্বাদেশিকতা, অন্ধ জাতীয়তা, ধর্মীয় গোঁড়ামি রবীন্দ্রনাথের বেপরোয়া কলমের খোঁচা থেকে কিছুই রেহাই পায় নি। মুসলমানের মনে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোধ জাগ্রত হওয়ার বহু আগেই সেই স্বদেশী যুগের বোমা পিস্তলের আদিপর্বে তিনি তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদ-সম্বন্ধে শুধু নয়— 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের যথার্থতা-সম্বন্ধেও প্রশ্ন তুলে অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এই মহাকবি অসংখ্য কবিতা, গানে, নাটকে যে-বেপরোয়া মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। শরৎচন্দ্র ছাড়া শরৎচন্দ্রের কালে বই-এর নাম 'চরিত্রহীন' কেউ কি কল্পনা করতে পারত? এক বিখ্যাত মাসিক তো শুধু এ নামের জন্যই ঐ লেখা ছাপতে অস্বীকার করেছিলো! অমন বেপরোয়া ছিলেন বলেই তো তাঁর পক্ষে রাজলক্ষ্মীর মত মেয়েকে বা বাসার ঝি সাবিত্রীকে বাংলা সাহিত্যে এক অভাবিতপূর্ব মর্যাদা দান সম্ভব হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও কি কম বেপরোয়া ছিলেন? না হলে, সেই যুগে রোহিণী চরিত্র আঁকা কিছুতেই সম্ভব হতো না। ভাবুন, কতখানি বেপরোয়া হতে পারলে 'বিদ্রোহী'র মতো কবিতা লেখা যায়? নজরুল ছাড়া বারাঙ্গনা নিয়ে অমন জোরালো কবিতা আর কে লিখতে পারতো? এখন তো ঐ রকম কবিতা লেখার কথা ভাবাই যায় না। বেপরোয়া মনোভাবের উত্তরাধিকারী ছাড়া বড় সাহিত্য, মহৎ সাহিত্য রচিত হতে পারে কি না এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বলা বাহুল্য, অনুকূল পরিবেশই তেমন মনোভাবের জন্ম দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে স্মরণীয়: এই সেদিন আবদুল মান্নান সৈয়দের 'সত্যের মতো বদমাস' গল্পের বইটা বাজেয়াপ্ত হয়েছে!

ছয়

স্বাধীনতার পর থেকেই—কি লিখলে, কেমন করে লিখলে শাসক আর প্রতিক্রিয়াশীলদের বিষ নজরে পড়বো না এ আমাদের এক দুশ্চিন্তা আর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে গত বাইশ বছর ধরে আমাদের অনেকেই বিনা আবেগে আর বিনা প্রেরণায় বহু শ্লোগান আউড়িয়েছেন, যা সাহিত্যকে মোটেও সামনের

দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে নি। বরং দেখা গেছে যাঁরা বেশী করে শ্লোগান আউড়িয়েছেন তাঁদের পদক্ষেপ সামনের চেয়ে পেছনের দিকেই হয়েছে দ্রুততর। কারণ পেশা তথা অর্থকর আবেগ আর প্রেরণা ছাড়া এ সবের পেছনে আন্তরিতার লেশমাত্রও ছিল না। বলা বাহুল্য, আন্তরিকতা সাহিত্য শিল্পের প্রাথমিক শর্ত। দেশের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আমাদের মনের আন্তরিকতাকে শুধু-যে অঙ্কুরিত হতে দেয় নি তা নয়, যা ছিল সহজাত তাকেও অনেকখানি বিনষ্ট করে ছেড়েছে গত দশ বারো বছরের চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বৈরাচারী শাসন। এমন অবস্থার হেরফেরে পড়ে আমাদের সুপ্রাচীন দেশজ স্মৃতি, আর কল্পনার তো অপমৃত্যু ঘটেছেই নতুন কোন স্মৃতি আর কল্পনা ঐতিহ্যের রূপ নিয়ে, আবেগ ও প্রেরণায় অনুরঞ্জিত হয়ে সাহিত্যের উপকরণ হতে কিংবা শিল্পরূপ নিতে পারে নি। আমাদের লেখকরা ভাষা আর ঐতিহ্য, স্মৃতি আর কল্পনার দ্বন্দ্ব থেকে—স্বাধীনতার এই বাইশ বছরেও কিছুতেই অব্যাহতি পাচ্ছে না, পাচ্ছে না নিজেদের দুর্বলতার জন্য যতখানি, তার চেয়ে বেশী পরিবেশের প্রতিকূলতার জন্যই। আজো শিল্পী আর বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে এ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে।

রাষ্ট্র : সমাজ আর ছাত্র

রাষ্ট্র, সমাজ আর ছাত্র এর কোনটাই বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্ক-রহিত নয়। মানুষের সমস্ত জীবনটাই এখন এত জটিলসূত্রে জড়িয়ে গেছে যে, ছাত্র অ-ছাত্র কারো অব্যাহতি নেই তার হাত থেকে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কিছুকেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা বা সে সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকা আজ কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

কালের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলে যাচ্ছে, জীবন আর জীবনের সমস্যারও রূপ-বদল ঘটছে প্রতিমুহূর্তে। এ কালস্রোতকে উপলব্ধির উপরই নির্ভর করে জীবন আর জীবনের সমস্যারও সমাধান। যখন তপোবন কিংবা তপস্বী মানুষের স্মৃতিতেও অনুপস্থিত তখন অধ্যয়নং তপঃ কথাটা স্রেফ আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। ছাত্ররাও সমাজের অঙ্গ, সমাজের উৎপন্ন, সমাজের সার্বিক অবস্থা আর পরিবেশ এড়িয়ে যাওয়া অন্যের মতো তাদেরও সাধ্যাতীত। যেমন সাধ্যাতীত গা না ভিজিয়ে সাঁতার কাটা। কেউ ইচ্ছে করে উটপাখি সাজতে চাইলেও সাজা সম্ভব নয় আজ কিছুতেই।

এখন সমাজের সার্বিক দৃষ্টি-ভঙ্গী হয়েছে ক্ষমতা আর দাপটের দৃষ্টিভঙ্গী। ক্ষমতার দর্শনই আজ জাতির সামনে একমাত্র দর্শন—শাসকরা এ দর্শনের এক একজন পীর মুর্শীদ! ছাত্র-জীবনে তাঁরা কেউই অধ্যয়নকে তপস্যা করে নিয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই বরং বিপরীতটাই শোনা যায়। তাঁরা কেউই আমাদের এ পবিত্রভূমিতে আসমান থেকে নাজেল হন নি বা আসেন নি কোন অজ্ঞাত দেশ থেকে। তাঁদের অতীত ইতিহাস আমাদের অনেকেরই দেখা ও জানা আছে তবে বলার সাহস নেই। তাঁদের সম্বন্ধে ভক্তি-ভালোবাসা না থাকলেও ভয়টা সবাইর পুরোপুরি আছে। নিজের মাথাটার নিরাপত্তা রক্ষা করে চলাও এক রকম জীব-ধর্ম। তাই অন্যায় অবিচারের সামনেও আমরা ভয়ে চুপ করে থাকি —এভাবে দিন দিনই আমরা হারিয়ে ফেলছি সত্য বলার সাহস!

এ অবস্থা যদি কোন শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে গৌরবের হয়, আমাদের বর্তমান শাসকেরা নিঃসন্দেহে এ গৌরব দাবী করতে পারে।

তবে এ কথাও সত্য যে, ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন একদিন নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনে। দেখা গেছে ভয় আর আতঙ্ক সব সময় এমন একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়ে থাকে যে, যা কখনো শাসক আর শাসিতের পক্ষে শুভ হয় না। এ প্রসঙ্গে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে : "A state founded upon interest and cemented by fear is an ignoble and unsafe construction." (Amiel's *Journal*, p. 178)। Amiel যে-স্বার্থের কথা বলেছেন তার পরিচয় পাওয়া যেত ক্ষমতাসীন আর তাঁদের সন্তানসন্ততিরা, ক্ষমতায় আসার আগে কতখানি সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন আর এখন তাঁদের ধনসম্পদের পরিমাণ কত তার একটা তুলনামূলক পরিসংখ্যান পাওয়া গেলে। কিন্তু তা পাওয়ার উপায় নেই। কেউ পেতে চাইলে, সত্য জানতে চাওয়ার অপরাধে তার কপালে জুটবে বহু দুর্ভোগ! স্রেফ স্বার্থ আর ভয়ের দ্বারা তালি-দেওয়া রাষ্ট্রের অবস্থা যে-তালি-দেওয়া জামা কাপড়ের চেয়ে কিছুমাত্র মজবুত নয়, অবাধ ক্ষমতার মাথায় এ সহজ সত্যটা কিছুতেই ঢুকছে না। শোনা ছিল যুদ্ধের সময় সর্বাগ্রে সত্যই শহীদ হয়ে থাকে, এখন দেখছি আমাদের রাষ্ট্রে পুরোপুরি শান্তির সময় সত্য প্রতিদিন অত্যন্ত নির্মমভাবে কতল্ হচ্ছে।

আমাদের ছাত্র-সমাজ প্রতিনিয়ত এ দৃশ্য চোখের সামনে দেখছে আর এর মধ্যেই কাটছে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। এর অশুভ প্রভাব তারা এড়াবে কি করে? কোন কোন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-রাজনীতির দিকে তাকালে এর সত্যতা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

ক্ষমতার নিজস্ব একটা দুর্বলতা আছে, তাই ক্ষমতাসীনদের যেমন জনগণ কিছুটা ভয়ের চোখে দেখে তেমনি জনগণ-সম্পর্কেও তাঁদের মনে বেশ বড় রকমের আতঙ্ক রয়েছে। এ কারণে অনেক সময় তাঁরা তাঁদের কথা আর আচরণে ভারসাম্য হারিয়ে বসেন। ক্ষমতার কাছে ক্ষমতা হারানোর চেয়ে বড় আতঙ্ক আর কিছু হতে পারে না—এ আতঙ্কটাই তাঁদের মুখে বিরোধী দলের প্রতি নির্বিচার নিন্দা আর ভৎর্সনা হয়েই প্রকাশ পায়। তাঁদের কথা শুনলে মনে হয় ক্ষমতা স্রেফ তাঁদের জন্যই হালাল, সুপথ্য আর স্বাস্থ্যপ্রদ আর বিরোধী দলের জন্য তা বিলকুল হারাম, কুপথ্য আর অস্বাস্থ্যকর!

অতীতে সৎলোকেরা অন্যকে চিনি খেতে বারণ করার আগে নিজেরা চিনি

খাওয়া ছেড়ে দিতেন। আমাদের বুজর্গদের ব্যবহার কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাঁরা নিজেরা মুঠোয় মুঠোয় চিনি দেশশুদ্ধ ছেলে-বুড়ো সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাচ্ছেন আর উপদেশ দেওয়ার বেলায় বলছেন—তোমরা চিনির লোভ করো না, চিনি খেয়ো না, খেলে ক্রিমি হয়, অসুখ করে, তখন দেশটাই গোল্লায় যাবে ইত্যাদি! তাঁরা নিজেরা গাছের মগ ডালে চড়ে পাকা পাকা ফল ডান হাতে বাঁ হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছেন—যে-গাছ রোপণে তাঁদের অনেকেরই কোন হাত ছিল না। আর আজ তাঁরা অন্যদের ধমকাচ্ছেন—খবরদার গাছে চড়ো না, চড়লে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে আর তখন দেশটাই হয়ে যাবে খণ্ড খণ্ড। ক্ষমতার যুক্তি এমনি অদ্ভুত, গল্পের নেকড়ে বাঘের যুক্তিকেও তা হার মানায়।

আমি অন্য এক প্রবন্ধে বলেছি গণতন্ত্র দুই-পা-বিশিষ্ট জীব—এর এক পা সরকার অন্য পা বিরোধী দল। এর এক পা খোঁড়া বা পঙ্গু হলে বা রাখা হলে পঙ্গু করে, তখন সমস্ত রাষ্ট্র-জীবনটাই খোঁড়া না হয়ে পারে না। এখন দেশে সত্য অর্থে কোন রাজনৈতিক জীবন নেই। সুস্থ স্বাধীন ও সহিষ্ণু রাজনীতি থাকলে, এখনকার ছাত্রদের মধ্য থেকেই সার্থক ও যোগ্য রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব সম্ভব হতো। এখন রাজনীতি একদিকে খোশামোদ-তোষামোদ অন্যদিকে ভয়-ভীতি আর দমনের বস্তু হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় সুস্থ আর স্বাধীন রাজনীতি আশা করা যায় না। বিরোধী দল ছাড়া গণতান্ত্রিক রাজনীতি চলে না, চলতে পারে না, অথচ আমাদের সরকারী মুখপাত্রদের কাছে বিরোধী দল যেন ষাঁড়ের সামনে লাল শালু। আধুনিক গণতন্ত্রের জন্মভূমি ইংলণ্ডে সরকারকে যেমন বলা হয় হিজ্ বা হার্ ম্যাজেস্টিস্ গভর্নমেন্ট তেমনি বিরোধী দলকেও বলা হয় হিজ্ বা হার্ ম্যাজেস্টিস্ অপজিসন্। বিরোধী দলের প্রতি এ সসম্মান স্বীকৃতির উপর গণতন্ত্র আর গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করে। এ গণতান্ত্রিক চেতনার অভাবের ফলেই আমাদের দেশে রাজনীতিতে গালাগাল্পি, ধমকানি, হুঁশিয়ারি ইত্যাদির আমদানি আর সেই সঙ্গে বিরোধী দলের মুখপত্র বন্ধ করে দেওয়া আর তার কর্মীদের বিনা বিচারে আটক রাখা।

নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী আর স্বাধীন সংবাদপত্র ছাড়া সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা আজ প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সরকারী

বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর না করে সংবাদপত্র শিল্পের টিকে থাকা এক রকম অসম্ভব বললেই চলে। এখন বিজ্ঞাপন যেভাবে ও যে-শর্তে বিতরিত হয় তাতে কোন স্বাধীন সংবাদপত্রের পক্ষেই অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয় আদৌ। "সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী আর সে সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন"—বিভিন্ন সময় সরকারী মুখপাত্ররা এ ধরনের কথা-যে বলে থাকেন তার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার এতটুকু সম্পর্কও নেই। তাঁরা যদি কিছুমাত্র আন্তরিক হতেন তাহলে একটা প্রেস বাজেয়াপ্ত করে এক সঙ্গে তিন তিনটা কাগজ বন্ধ করে দিতেন না আর সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই নতুন নির্দেশ জারি করে আইনের হুকুমকে নস্যাৎ করে দিতে বোধ করতেন সংকোচ।

আইন তো জড়বস্তু—তার কার্যকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে প্রয়োগকর্তার উপর। তাঁর যদি আইনের প্রতি আনুগত্য না থাকে তাহলে ইচ্ছামতো তিনি আইনকে দোমড়াতে মোচড়াতে পারেন, এমনকি করে দিতে পারেন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। অবাধ ক্ষমতার এও এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ফলে আইনের শাসন বলতে যা বোঝায় তা আজ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ বিপর্যয়-যে কোথায় পৌঁছেছে তার নজির সন্ধানের জন্য দূরে যেতে হয় না। আমাদের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয় বছরে যে-সব ঘটনা ঘটেছে আইন সেখানে যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, ছাত্র আর অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে মামলা করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় যত অর্থ ব্যয় করেছে যার কোন তুলনা নেই, কারো কারো মতে ওটা নাকি world record! এসব দেখে শুনে রীতিমতো শঙ্কিত হতে হয় দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে।

সভ্য মানুষ আর সভ্য সমাজের একমাত্র আশ্রয় তো দেশের আইন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে আইনের আশ্রয় নিতে গিয়ে একজন যোগ্য ও সম্মানিত অধ্যাপক কিভাবে নাজেহাল হয়েছেন সে করুণ ও দুঃসহ সংবাদ অনেকেরই জানা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্রাবাস আর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বারে বারে আক্রান্ত হয়েছে, দুঃখের বিষয় দেশের আইন এসব ব্যাপারে নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বরং শোনা যায় আক্রমণকারীদের পরিবর্তে আক্রান্তদের বিরুদ্ধেই নাকি হয়েছে আইনের প্রয়োগ। আইন যদি এভাবে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবার কৌশলে পরিণত হয় তাহলে সমাজ কোথায় দাঁড়াবে, মজলুম প্রতিকারের আশায় কার মুখের দিকে চাইবে?

সেদিন মনস্তত্ত্ব সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছেন : 'দেশের তরুণরা এমন সিনিক হয়ে পড়েছে কেন?' সমাজের সার্বিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখলে তিনি তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতেন। রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, শিক্ষায়তন আর বিচারালয়গুলিতে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে মূল্যবোধের যে-চরম অবনতি ও দুরবস্থা তরুণরা, বিশেষ করে সচেতন ছাত্র সমাজ প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছে তাতে সিনিক না হয়ে উপায় কি? এসবের প্রভাব তারা এড়াবে কি করে? সমাজের কোথাও সততা, আন্তরিকতা, মহৎ চিন্তা-ভাবনা বা ন্যায়-বিচারের ক্ষীণ রেখাও তারা দেখতে পাচ্ছে কি যা দেখে ছাত্র-সমাজ প্রেরণা পাবে, উৎসাহ বোধ করবে কিংবা আশান্বিত হয়ে উঠবে? Amiel অন্যত্র বলেছেন : "Society rests upon conscience not upon science. Civilization is first and foremost a moral thing." (Amiel's *Journal*, p. 177). বিবেকের চর্চা আর অনুশীলন কি সমাজে কোথাও আছে এখন, না তার কোন মূল্য দিয়ে থাকে সমাজ ও রাষ্ট্র? বিবেকী মানুষের আজ কোন স্থান নেই সমাজে আর তেমন মানুষকে রাষ্ট্র মনে করে তার শত্রু। সরকার চায় Yes-man, হাঁ-হুজুর অথবা ভয়ে কাবু হয়ে থাকা নির্বীর্য মানুষ। বিবেকের সাথে আইনের শাসন চালাতে গিয়ে কোন কোন সুদক্ষ বিচারপতিকে-যে সরকারের বিরাগ-ভাজন হতে হয়েছে, এমন কি পরিণামে পদত্যাগ করতে হয়েছে সে খবরও কারো অজানা নয়।

গ্রীসকে বলা হয় আধুনিক সভ্যতার সূতিকা-গৃহ—সে গ্রীসের অধিবাসীদের সম্বন্ধে হেরোডোটাসের মন্তব্য হচ্ছে : "They obey only the law." শুধু গ্রীসের নয় সব সভ্যতারই বুনিয়াদ আইন আর আইনের প্রতি শাসক আর শাসিতের সার্বিক আনুগত্য। সে আইনের লাঞ্ছনা এখন প্রতিনিয়তই ঘটছে আমাদের দেশে। সভ্য-জীবনের প্রথম কারিগর শিক্ষক আর শিক্ষাবিদের যেমন আজ কোন সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা নেই তেমনি সম্মান আর মর্যাদা নেই বিচারক আর বিচারপতিদেরও। শুনেছি মুসলিম শাসনের আমলে বাদশাহের পাশেই থাকতো কাজীউল-কুজ্জাতের আসন। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রকে ইসলামী তথা মুসলিম রাষ্ট্র বলা হয় তবু এ ইসলামী ঐতিহ্য আজ এখানে সর্বতোভাবে উপেক্ষিত। এ রাষ্ট্রে এক মহিলার রাজনৈতিক মতামতের জন্য তাঁর স্বামীকে চাকুরী থেকে সাস্‌পেণ্ড করা হয়েছে বলে এক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত

হয়েছিল কিছুকাল আগে। ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, স্বতন্ত্র পেশা, বৃত্তি ও জীবনযাপন স্বীকৃত! শুধু রাজনৈতিক মতামত নয়, স্বামী-স্ত্রীর ভিন্নতর ধর্মমত পোষণেও ইসলামে আপত্তি নেই। ইসলামী বিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব আর স্বাভাবিকত্ব হচ্ছে এ বিয়েতে নর-নারীকে সমান মানবিক মর্যাদা দিয়ে থাকে! এ বিয়ে স্বামীকে স্ত্রীর আর স্ত্রীকে স্বামীর দাস-দাসীতে পরিণত করে না। আমার বিশ্বাস স্বামীর ধর্মীয় পাপের জন্য স্ত্রীকে আর স্ত্রীর ধর্মীয় পাপের জন্য স্বামীকে দোজখে পাঠাবার বিধান ইসলামে নেই। স্ত্রীর রাজনৈতিক মতামতের জন্য স্বামীকেও দণ্ড দেওয়ার বিধান ইসলামী আইনে আছে কিনা সে কথা আমাদের ইসলামী উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরাই বলতে পারবেন ভালো!

চোখ কান মন খোলা রেখে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে এমন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবার বহু দৃষ্টান্তই দেখতে পাওয়া যাবে। আমাদের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিভাগীয় অধ্যক্ষের পদ খালি হয়েছিল। পরবর্তী নিম্নতর পদের অধিকারী হিসেবে যিনি ঐ শূন্যপদে কাজ করার হক্‌দার তাঁর সঙ্গে কি ব্যাপারে যেন কর্তৃপক্ষের মন কষাকষি ছিল, তাই স্রেফ তাঁকে জব্দ করার মতলবে অন্য বিভাগের এক অধ্যক্ষকে এনে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এ বিভাগেরও ভার তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এতে কর্তৃপক্ষের প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হলো বটে কিন্তু মানুষের সাধারণ বুদ্ধি বলে এ ব্যবস্থায় দুই বিভাগের কোন বিভাগই পুরোপুরি যোগ্যতার সাথে পরিচালিত হতে পারে না। কথায় বলে —রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে উলুখড় প্রাণে মরে, এ দুই বিভাগের ছাত্ররাই সেই উলুখড়। প্রতিদিন ক্ষতি যা হওয়ার তাদেরই হচ্ছে বা হয়েছে। অবাধ ক্ষমতা অনেক সময় এ ভাবে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করতে পেছপাও হয় না! ছাত্ররা আমাদের সমাজের সবচেয়ে সচেতন অংশ, এসব ঘটনা আর দৃশ্য তাদের মনের উপর কোন প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে না এ কথা ভাবতে হলে মানব-বুদ্ধিকে অস্বীকার করতে হয়।

যে-ভয় ও আতঙ্কের কথা সূচনায় উল্লেখ করেছি তা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, তার অশুভ থাবা প্রদেশের শিক্ষায়তনগুলিতেও হয়েছে সম্প্রসারিত। Academic freedom তথা জ্ঞানগত স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তা আজ সর্বত্র অনুপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও এখন আর স্বাধীনভাবে চিন্তার চর্চা করেন না, করলেও প্রকাশ করতে সাহস পান না। এ অবস্থায় দেশে

চিন্তাবিদের আর সত্যিকার সংস্কৃতিসেবীর আবির্ভাব সুদূর কল্পনার বাইরে। আমরা প্রায় চল্লিশ বছর আগে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে 'বুদ্ধির মুক্তি' নামে একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, আর তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় আর চারপাশের কলেজ আর স্কুলের অধ্যাপক আর শিক্ষক-বৃন্দ। আজ কি তেমন কথা ভাবা যায়? নবতর চিন্তার ক্ষেত্রে, যে-চিন্তার সঙ্গে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে, তাতে অংশগ্রহণ কিংবা নেতৃত্বদানের কথা বললে অধিকাংশ অধ্যাপক এখন রীতিমতো আঁৎকে ওঠেন। অথচ স্বাধীন চিন্তা আর স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ছাড়া কোন সমাজ কোন রাষ্ট্র এবং কোন সভ্যতাই সামনের দিকে এগুতে পারে না। গ্রীক-রোম আর আরব-সভ্যতার যুগে যাদেরে 'স্বাধীন নাগরিক' বলা হতো, এ অবস্থা আরো কিছুকাল চললে, তেমন স্বাধীন নাগরিক আমাদের দেশে দুর্লভ হয়ে পড়বে। গ্রীক কবি ইউরিপিডিস্ গোলাম বা দাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই বলে: "A slave is he who cannot speak his thought."

আমার আশঙ্কা, দোতলা, চৌতলা কিংবা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাড়ি গাড়ি বা টেলিভিশন ইত্যাদি যাবতীয় আধুনিক সুখ-সম্পদের মালিক হয়েও আমরা দিন দিন মনের দিক দিয়ে দাসে পরিণত হচ্ছি। বলা বাহুল্য, স্বাধীন মনই সব সভ্যতার বাহন আর সবরকম সাংস্কৃতিক উপকরণের নির্মাতা। সে স্বাধীন মনের অধিকার হারানো মানে মনের দিক দিয়ে গোলাম হয়ে যাওয়া। এ দেশের সংস্কৃতিসেবীরা আজ এ দুর্দিনের সম্মুখীন। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে: 'মাছ যখন পচতে আরম্ভ করে পচনটা শুরু হয় মাথা থেকেই'। দেশের শাসক-প্রকাশক, উচ্চতম শিক্ষায়তনগুলির কর্ম-কর্তা, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, আইনজীবী, ডাক্তার, সমাজনেতা, আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ইত্যাদিকে নিয়েই তো সমাজের মাথা—এ মাথা যদি সুস্থ না থাকে, এখানে যদি পচন শুরু হয়, তাহলে মাছের মতো এ পচনও কি সমাজের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে না? এ পচনের মুখে নৈতিক চেতনা, সব রকম মূল্য-বোধ ও সুরুচি, যা নিয়ে সভ্যতার ভিত রচিত হয় তা আজ দেশ-ছাড়া হওয়ার উপক্রম। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ছাত্র আর তরুণদের কি আশাবাদী হওয়া সম্ভব?

শিক্ষকদের প্রতি ভাষণ

স্বাগতম্। আমি অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সর্বান্তঃকরণে আপনাদের স্বাগতম্ জানাচ্ছি। আপনারা অনেকে বিভিন্ন জেলা আর দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন, পথকষ্ট ছাড়াও আরও বহুতর অসুবিধের ঝুঁকি নিয়েই আপনাদের আসতে হয়েছে এ সম্মেলনে। খোশামোদ-তোষামোদ, ভয়-ভীতি ও প্রলোভনকে আপনারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা জয় না করলে করবে কে? সত্য ও মনুষ্যত্বের দীক্ষা-গুরু আপনারা—জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের চরিত্র ও বিবেক গঠনের দায়িত্ব আপনাদের। মিথ্যা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনাদের মাথা সব সময় সমুন্নত থাকবে—এ আপনাদের আবহমান কালের পেশাগত ঐতিহ্য। এ আপনাদের মহান ভূমিকা। আমি জানি এ ভূমিকা পালন আজ আপনাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষকের পেশাগত জীবনও আজ বিপৎ-সংকুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের জন্য, জাতির জন্য, এর চেয়ে অশুভ লক্ষণ আর হতে পারে না। আধুনিক সমাজ-জীবনের বহুতর ব্যাধির মধ্যে এ আর একটি মারাত্মক ব্যাধি দিন দিনই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। অবশ্য এ কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়—সামগ্রিক সমাজ-জীবনেরই এ এক আপেক্ষিক প্রতিক্রিয়া। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামও তাই সামগ্রিক হতে হবে, একক বা বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় এর প্রতিকার সম্ভব নয়। সামাজিক এ অবক্ষয় মেনে নিয়েও বলতে হয় শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন ও পেশাগত নিরাপত্তার জন্য যে-সংগ্রাম তা শিক্ষকদেরই সংঘবদ্ধ ও যৌথ ভাবে চালাতে হবে। একক সংগ্রামের দিন আজ আর নেই—তাই সংঘ বা প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক আর অত্যাবশ্যক সে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য। সুশৃঙ্খলভাবে একই প্রতিষ্ঠানের পতাকাতলে আপনারা ঐক্যবদ্ধ না হলে আত্মমর্যাদার সাথে আত্মরক্ষা আপনাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। অল্পকাল আগেও শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চে—অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজ আর সে কথা বলার উপায় নেই। সামাজিক মর্যাদা ও আভিজাত্য আজ এত বেশী অর্থ-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে যে,

তার সঙ্গে বিশেষ করে বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষকরা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না। অথচ দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার শতকরা আশি ভাগ দায়িত্ব এঁরাই পালন করছেন—সুদীর্ঘকাল ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছেন। সারা প্রদেশে কয়টাই বা সরকারী স্কুল ? জেলার সদরে সদরে প্রতিষ্ঠিত গোনা-গুনতি এ কয়টা স্কুল বাদ দিলে বাদ-বাকী সবই তো বে-সরকারী স্কুল। এসব স্কুল আর তার শিক্ষকরাই তো এ দেশে শিক্ষার ধারাটাকে জারি রেখেছেন—সুদূর গ্রামাঞ্চলে, নিভৃত দুর্গম পাড়াগাঁয়ে যেখানে সরকারী কৃপা-দৃষ্টি কখনও পড়ে না, সেখানে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন এঁরাই—বে-সরকারী স্কুলের উপেক্ষিত এ শিক্ষকরাই। আমরা জানি জীবনের অধিকাংশ সময় এঁদের অনেককে কায়ক্লেশে দেহের সঙ্গে প্রাণটুকুকে ধরে রেখে নিজ নিজ কর্তব্য করে যেতে হয়। তবুও দেশ থেকে শিক্ষার আলো নিবিয়ে যেতে দেন নি এঁরা। এঁদের এ ত্যাগ তিতিক্ষা ও নিষ্ঠার ইতিহাস কখনো লেখা হবে কিনা জানি না। আমরা জানি অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এসব বিত্তহীন শিক্ষকদের নিজের উদ্যোগে, নিজের চেষ্টায়। সে সবকে গড়ে তুলতে, চালু রাখতে এঁদের অহরহ করতে হয়েছে বহুতর বিরুদ্ধ শক্তি ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম। তবুও তাঁরা হাল ছাড়েন নি। শিক্ষার আলোকবর্তিকা তাঁরা সব সময় তুলে ধরেছেন দেশের সামনে, সমাজের সামনে, জাতির সামনে। জাতি তাঁদের কাছে ঋণী, যদিও এ ঋণ আজো রয়ে গেছে সামাজিকভাবে অস্বীকৃত। শিক্ষকরাই দেশের সব চেয়ে সচেতন নাগরিক—সমাজের সামনে সব রকম মহৎ-চেতনার আদর্শ তাঁরাই তুলে ধরেন। অতীতে সমাজ এ আদর্শের মূল্য বুঝতো, মূল্য দিতও। সেদিন শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতি ছিল বলে যে-কোন মহৎ আদর্শের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরা তাঁদের পক্ষে সহজ ছিল। শুধু সামাজিক মর্যাদা নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে, পেশাগত জীবনেও তখন শিক্ষকেরা পুরোপুরি স্বাধীন ছিলেন। আজ বে-সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সরকারী হস্তক্ষেপ যে-ভাবে প্রসারিত হয়েছে তাতে শিক্ষকের সে স্বাধীনতাটুকুও আজ বিপন্ন। সরকারী চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা আর অর্থকরী নিরাপত্তা থেকে বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষকরা বঞ্চিত অথচ সরকারী কর্তৃত্বের যতরকম অসুবিধা আছে তাঁরা এখন তার সহজ শিকারে পরিণত। পালন নেই কিন্তু শাসন আছে পুরোপুরি। অদৃষ্টের পরিহাসটা এখানেই ! পেটে খেলে পিঠে সয় প্রাচীন এ বাক্যটা এখন উল্টে গেছে—

এখন পেটে না খেয়েই পিঠে সইতে হচ্ছে শিক্ষকদের! শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা স্বাধীন পরিবেশ ও মুক্ত আবহাওয়া অপরিহার্য—একটা সার্বিক কর্তৃত্ব ও আতঙ্কের মধ্যে শিক্ষক কখনো যথাযথভাবে নিজের ভূমিকা পালন করতে পারেন না। আরো দুঃখের বিষয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব পালন করেন তাঁরাই, যাঁরা কেউই শিক্ষাবিদ্ নন—শিক্ষাপদ্ধতি-সম্বন্ধে যাঁদের কোন ধারণাই নেই। এ অবস্থায় অনেক সময় শিক্ষকের পক্ষে আত্মমর্যাদা রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়ে। শিক্ষার একটি বড় লক্ষ্য—আত্মমর্যাদাশীল নাগরিক গড়ে তোলা। যেখানে স্বয়ং শিক্ষককেই পদে পদে আত্মমর্যাদা খোয়াতে হয় সেখানে তিনি যথাযথভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন কি করে? কি করে তিনি ছাত্রদের সামনে প্রতিষ্ঠা করবেন আত্মমর্যাদার আদর্শ? এক-কালে শিক্ষকরাই ছিলেন সমাজের স্বাভাবিক নেতা—আজ তাঁরা অনেকখানি কৃপার পাত্রে পরিণত। আর্থিক আভিজাত্য, আভিজাত্য তো নয় প্রতাপ—এ প্রতাপের ফলে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী আমূল বদলে গেছে। শিক্ষা আজ স্রেফ বৈষয়িক ব্যাপারে পরিণত—অন্য দশটা বৈষয়িক ব্যাপারকে সমাজ যে-চোখে দেখে, শিক্ষাকেও এখন অবিকল সে চোখেই দেখে থাকে, তারও মূল্যায়ন হয় সে ভাবে। চরিত্র কিংবা আত্মার বিকাশ সাধন—যা এক সময় শিক্ষার মহত্তম আদর্শ বলে গণ্য হতো—তা তো চোখে দেখা যায় না, মাপা যায় না বাটখারায়। তাই সমাজ সে সবের আর কোন মূল্য দেয় না এখন। সমাজ দেয় না বলে, সমাজের উৎপন্ন ছাত্র-ছাত্রীরাও দেয় না তার কোন মর্যাদা। যে-বস্তুর মূল্য সমাজ বা তারা দিয়ে থাকে তা থেকে অধিকাংশ শিক্ষকই বঞ্চিত। তাই সমাজের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরাও এখন শিক্ষককে অনেকখানি কৃপার চোখেই দেখতে শুরু করেছে। শিক্ষার জন্য এ কিছুমাত্র স্বাস্থ্যকর অনুকূল অবস্থা নয়। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর যদি বদল না ঘটে তাহলে সমাজ-দেহ থেকে নৈতিক অবনতির মূলোৎপাটন কিছুতেই সম্ভব হবে না। পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতিও এরই অনুষঙ্গ—কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এও সমাজ-দেহেরই একটি ক্ষত। শিক্ষকের একক চেষ্টায় এ ক্ষত দূর হতে পারে না। আগা-গোড়া নকল করে পাশ করলেও যেখানে ছাত্রের অভিভাবকরা খুশী হন আর শিক্ষক তাঁর পেশাগত কর্তব্য পালন করতে গেলে তাঁর বিরুদ্ধে আর অপরাধী ছাত্রের সমর্থনে অভিভাবক যেখানে আইন আর বে-আইনের হাতিয়ার নিয়ে ছুটে আসেন, সেখানে অসহায় শিক্ষক কি করতে

পারেন ? আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাও তো আমাদের সমাজেরই অঙ্গ। আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি কোন শূন্যমণ্ডলে বিরাজ করে না। সমাজেই তার অবস্থান —সমাজে আর সমাজের জন্যই তার শিক্ষাদান। আমরা কেমনতর সমাজ চাই তার উপরই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপ আর স্বরূপ অনেকখানি নির্ভর করছে। সমাজ যদি সৎ হয় আর সৎ নাগরিক কামনা করে, আর দেয় সততার মর্যাদা— তাহলে আমাদের শিক্ষানিকেতন থেকে বেরিয়ে না আসার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজ কি তা চায় ? সমাজের কি তেমন দাবী আছে ? সমাজ কি একজন সৎ গরীব থেকে একজন রীতিমতো অসৎ ধনীকেই অধিকতর মর্যাদা দেয় না ? এ অবস্থায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও ফল বিপরীত হওয়ার কথা নয়। সমাজ দুর্নীতিমুক্ত না হলে, অন্তত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী যদি দুর্নীতি-বিরোধী না হয় তাহলে শিক্ষার আনুষঙ্গিক পরীক্ষা ইত্যাদি থেকেও দুর্নীতি পুরোপুরি দূর হবে কিনা সন্দেহ।

শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাকার বহু সমস্যাই জড়িয়ে আছে—সব মিলিয়েই একটা জাতির জীবন-দর্শন, যে জীবন-দর্শন সে জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তা আর নীতি-যে শুধু বিশৃঙ্খল তা নয়, পুরোপুরি নৈরাজ্যিকই বলা যায়। ফলে আমাদের শিক্ষা-নীতি স্রেফ বুলি-সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। আমাদের শিক্ষা-পরিচালকগণ মুখে যা বলেন তার সঙ্গে তাঁদের অনুসৃত নীতির কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষা-ব্যবস্থা স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে তা কখনো ফলপ্রসূ হয় না। শুধু আবেগ-উচ্ছ্বাস আর অর্থ-বরাদ্দের বড় বড় সংখ্যা দিয়ে শিক্ষা সমস্যার সমাধান করা যাবে না, যাবে না শিক্ষার দ্রুত অবনতি রোধ করাও। সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক নীতি চাই, চাই দেশের চাহিদা ও মানসিক মূল্যবোধের সুসম সমন্বয়। এ করার যোগ্যতা যদি কারো থাকে তা আছে শিক্ষক আর শিক্ষাবিদদের। রাজনৈতিক নেতা আর প্রশাসনিকরা এর থেকে দূরে থাকলেই দেশের মঙ্গল।

মাধ্যমিক শিক্ষা আমাদের সারা শিক্ষা-জীবনের মেরুদণ্ড ; এ মেরুদণ্ড মজবুত ও শক্ত না হলে পরবর্তী উচ্চ পর্যায়ের সব শিক্ষাই নড়বড়ে ও কাঁচা থেকে যেতে বাধ্য। এমন কি সে শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ্য আর যোগ্যতাও অধিকাংশের আয়ত্তের বাইরে থেকে যাবে। এমন উচ্চতম ডিগ্রীও-যে যোগ্যতার নিঃসন্দেহে মানদণ্ড

হিসেবে গ্রহণ করা যায় না তার কারণও এখানেই নিহিত বলে আমার বিশ্বাস। মস্তিষ্কের সঙ্গে মানব-দেহের নিম্নাঙ্গের যোগসূত্র যেমন মেরুদণ্ডের সাহায্যেই রক্ষিত হয় তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রাথমিক আর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের যোগসূত্র রক্ষা করে মাধ্যমিক শিক্ষা তথা মাধ্যমিক স্কুলগুলিই। মানুষের সার্বিক শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা ইত্যাদি সব কিছুই যেমন মেরুদণ্ডের সবলতার উপর নির্ভর করে তেমনি আমাদের সামগ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তর-সম্বন্ধেও সে কথাই বলা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষা দৃঢ়ভিত্তিক না হলে শিক্ষার সামগ্রিক কাঠামোই দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা সুবিন্যস্ত হওয়া চাই। এ করার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সমাজের। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান খুঁটি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাই। এঁদের জীবিকার নিরাপত্তা আর ভাগ্যোন্নয়নের সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের সম্পর্কও পুরোপুরি নির্ভরশীল। সরকার আর সমাজের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

কাল পরিবর্তনশীল—কালের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, সমাজ রাষ্ট্র সবকিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিবর্তন-সম্বন্ধে শিক্ষকদের ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। অতীতের ধ্যানধারণা নিয়ে তাঁরা অচল অটল হয়ে থাকলে, তাঁরা-যে শুধু যুগ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন তাই নয়, তাঁরা তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদেরও বুঝতে পারবেন না। উল্টো ভুল বুঝবেন পদে পদে। ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মানস বুঝতে পারার উপর শিক্ষকের শিক্ষাদানের সাফল্য অ-সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। তাই যুগ-চেতনা শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষকের মন যদি তাঁর নিজের শৈশব ও দূর অতীতে ফেলে-আসা ছাত্র জীবনের চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকে—কালের দীর্ঘ ব্যবধানটাকে যদি তিনি আমল দিতেই না চান, তাহলে ক্লাস-রুমে যত পরিশ্রমই তিনি করুন তাঁর সে পরিশ্রম মোটেও সুফলপ্রসূ হবে না —আর অকারণ ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতা হবে তাঁর চিরসাথী। এ যুগের মন নিয়েই এ যুগের ছাত্র-ছাত্রীকে বুঝতে হবে। শিক্ষা কখনো ভিক্ষা নয়—ভিক্ষাদানের মতো এ দেওয়া যায় না, ভিক্ষা গ্রহণের মতো যায় না গ্রহণ করাও।

সস্নেহে যেমন শিক্ষা দিতে হয় তেমনি গ্রহণ করতে হয় সবিনয়ে। পারস্পারিক বোঝাবুঝির ফলেই এর অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এ ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব অনেকখানি শিক্ষকের, তাই তাঁকে সচল মনের অধিকারী হতে হয়। তাহলেই তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝতে পারবেন—বুঝতে পারবেন তাদের মন ও মনের

প্রবণতা। বুঝতে পারবেন কোথায় তাদের দুর্বলতা, কোথায় তাদের সবলতা ও কি সব তাদের শিক্ষাগত সমস্যা। এ বোঝাপড়ার ফলেই শিক্ষাদান হয়ে ওঠে সার্থক।

মাতৃভাষাই শিক্ষার স্বাভাবিক মাধ্যম। এ মাধ্যম আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায়। ভবিষ্যতে প্রাথমিক থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত সব শিক্ষাই-যে মাতৃভাষার মাধ্যমে চালু হবে তাতে সন্দেহ নেই। তাই মাতৃভাষার শিক্ষার উপর আরো বেশী করে জোর দিতে হবে। আপনারা জানেন, মাতৃভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও পূর্বাপেক্ষা অনেক অবনতি ঘটেছে। এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী বর্তমান পাঠ্যপুস্তক—কোন কোন পাঠ্য বই এত নীচু মানের আর তার ভাষা এত দুর্বল যে, তা আর বলার নয়। সারা প্রদেশের জন্য একক পাঠ্য বই নির্ধারণও ছাত্রদের পাঠ্য এলাকাকে অত্যন্ত সীমিত করে দিয়েছে—ফলে অন্য গ্রন্থকার তথা তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থেকেও ছাত্ররা এখন বঞ্চিত। যে-কোন বিষয়ে মানোন্নয়নের একটি প্রমাণিত পন্থা হচ্ছে প্রতিযোগিতা—পাঠ্য বই রচনার ক্ষেত্রে সে প্রতিযোগিতা তিরোহিত হওয়ার ফলে পাঠ্য বইএর মানোন্নয়নের পথও এখন বন্ধ। এ কারণেও শিক্ষকদের দায়িত্ব এখন অনেক বেড়ে গেছে—পাঠ্য বই-এর সীমাবদ্ধতার অভাব পূরণ করতে হলে তাঁদের নিজেদের লেখাপড়াকে অব্যাহত রাখতে হবে, নিজেদের জ্ঞানের সীমাকে প্রতিদিনই বাড়াতে হবে। একমাত্র এ ভাবেই তাদের শিক্ষা-দানে বৈচিত্র্য আমদানি সম্ভব—ছাত্রদের কৌতূহল জাগিয়ে বিষয়ের প্রতি পূর্ণাঙ্গ সুবিচার করাও তখন তাঁদের পক্ষে হবে সহজ।

আমার বিশ্বাস—সফল শিক্ষক হওয়ার জন্য দেশের সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে পরিচয় রাখা ও পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক। সাহিত্য হচ্ছে মনকে সজীব, সতেজ, সচল ও গ্রহণশীল রাখার এক শ্রেষ্ঠ উপায়। দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতম ভাণ্ডার দেশের সাহিত্য আর সাহিত্যই সব দেশের বৃহত্তম মানসিক সম্পদ। এ সম্পদের সঙ্গে যে-শিক্ষকের পরিচয় আছে আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, তাঁর কাছে শিক্ষাদান কখনো নীরস ঠেকবে না আর কখনো অভাব বোধ করবেন না তিনি বিষয়বস্তুর। মাতৃভাষার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ছাড়া মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ কখনো পুরাপুরি সফল হতে পারে না। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আমার অনুরোধ—আপনারা

আপনাদের মাতৃভাষার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হোন, গভীর ভাবে পরিচিত হোন—আপনাদের পরিচয়কে প্রতিদিনই সম্প্রসারিত করুন। তাহলে আপনাদের ছাত্রদের প্রতি ও আপনারা যথাযথ সুবিচার করতে সক্ষম হবেন। উন্নাসিকতা কোন শিক্ষকেরই আদর্শ হতে পারে না। আমাদের সাহিত্য আশানুরূপ উন্নত নয় বলে তার প্রতি উন্নাসিক হওয়া মানে তার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হওয়া। গ্রহণ, সমজদারি, চর্চা, পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুশীলনের ফলেই সাহিত্যেরও সমৃদ্ধি ঘটে। শিক্ষা-জীবনের মাধ্যমিক স্তরেই অর্থাৎ মাধ্যমিক স্কুল থেকেই সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আর তার অনুশীলনের সূচনা। কাজেই এ স্তরের শিক্ষকরা যদি সাহিত্য-রসিক হন, স্বদেশের সাহিত্যের সঙ্গে যদি তাঁদের ভালো করে পরিচয় থাকে তাহলে ছাত্রদের মনে সাহিত্যের বীজ বপন তাঁদের পক্ষে সহজ হবে। শিক্ষকের কারবার যেমন ছাত্রদের মন-মানস নিয়ে তেমনি সাহিত্যেরও কারবার মানুষের মন-মানস নিয়ে। শিক্ষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত নিবিড়—শিক্ষা থেকে সাহিত্যকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয় শিক্ষককে সুশিক্ষক করে তোলে—এ আমার বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা।

ছাত্র রাজনীতির ভয়াবহ পরিণতি

এক

রাষ্ট্র থাকলে রাজনীতিও থাকবে এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু ছাত্রজীবন শিক্ষানবিশির জীবন, ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি আর দেহ-মন ও চরিত্রে গড়ে ওঠার কাল। রাজনীতি এসবের অন্তরায়। তাই ছাত্ররা কোন রকম প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিক, এ আমি চাই না—এর বিরুদ্ধে বার বার আমি আওয়াজ তুলেছি। ছাত্র আর অ-ছাত্র কেউই আমার কথায় কর্ণপাত করে নি। রাজনীতির আগে ছাত্র শব্দ যোগ করলেই রাজনীতির চরিত্র বদলে যায় না। আমাদের দেশে যে-রাজনীতি, বিশেষ করে আজাদীর পর গড়ে উঠেছে, মোড় নিয়েছে আর রূপ নিয়েছে ও নিচ্ছে তার অনিবার্য পরিণতি দলাদলি হিংসা-বিদ্বেষ চরম অসহিষ্ণুতা আর বিপক্ষের বা ভিন্ন দলের সৎমানুষকেও নিজের শুধু নয় দেশেরও শত্রু মনে করা। এ-সব কিশোর মনের জন্য, বেড়ে ওঠা চরিত্রের জন্য বিষের চেয়েও মারাত্মক। শিক্ষক আর একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে এ বিষ-ক্রিয়া আমি দেখেছি। তাই ছাত্র রাজনীতির আমি ঘোর-বিরোধী। তবে যে-কোন ছাত্রদল যখন আমাকে কিছু বলার জন্য আহ্বান করে তখন আমি তাদের ডাকে সাগ্রহে একারণে সাড়া দিয়ে থাকি যে, ওখানে গিয়ে বৃহত্তর ছাত্রসমাজকে কিছু ভালো কথা বলার সুযোগ হয়তো আমি পাবো। আমি যে-মঞ্চ থেকেই কথা বলি না কেন কারো মুখপাত্র হয়ে কথা বলি নি আজ পর্যন্ত। সব সময় আমার নিজের বক্তব্যই আমি বলেছি। ছাত্রদেরে বহু অপ্রিয় কথা আমি ছাত্রদের সভায় দাঁড়িয়ে তাদের সামনে বলতেও দ্বিধা করি নি। আমার বক্তব্যে আর আমার ভাষায় আমার বিশ্বাস আমার মতামতই প্রকাশিত হয়েছে। যাদের আহ্বানে আমি সভায় গিয়েছি তাদের মতামত তাতে কখনো প্রতিফলিত হয় নি। তিন চার বছর আগে এক ছাত্রসভায় ছাত্রদের সামনে পাঁচটি 'না' নীতিমালা আমি তুলে ধরেছিলাম। ছাত্র আর অ-ছাত্র উভয়ের সামনে সেগুলি আবারও এখানে উদ্ধৃত করছি :

(১) তোমাদের স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় বাইরের রাজনীতিকে ঢুকতে দিয়ো না।

(২) জেলা কিংবা এলাকা প্রীতিকে দিয়ো না প্রশ্রয়।

(৩) প্রশ্ন কঠিন হয়েছে কিংবা পরীক্ষা পেছানোর দাবীতে ধর্মঘট করে বসো না। কারণ এসব ছাত্রজীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ, এতে তোমাদের ক্ষতি হয় সব চেয়ে বেশী।

(৪) নৈতিক কারণে ছাড়া শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ো না।

(৫) কোন ব্যাপারেই করো না বাড়াবাড়ি। পরিমিতিবোধ আত্মমর্যাদার লক্ষণ।

ছাত্র সমাজের প্রতি এ পাঁচটি অনুরোধ আমার রইল।

(দেশ ও দেশের ছাত্র সমাজ : সমাজ সাহিত্য : রাষ্ট্র পৃঃ ২৯৫)

এ অনুরোধগুলির প্রতি বিশেষ করে প্রথমটির প্রতি আবারও নতুন করে আমার কণ্ঠের সমস্ত জোর দিয়ে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক আর শিক্ষানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দুই

এখন রাষ্ট্র সব ক্ষমতার মালিক আর সব ক্ষমতার উৎস। এ ক্ষমতা পরিচালিত হয় প্রশাসকদের হাত দিয়ে। প্রশাসনকে যন্ত্র বলা হলেও তা কিন্তু যান্ত্রিক নয়, তার পেছনে রয়েছে মানুষ। তাঁরাই চালান আর নিয়ন্ত্রণ করেন ক্ষমতা। এ মানুষ যদি ন্যায়নিষ্ঠ আর নিরপেক্ষ না হন, দলমত-নির্বিশেষে সকলের প্রতি তাঁরা যদি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন আর সম-দায়িত্বশীল না হন তাহলে অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। আর অরাজকতার শিকার কখনো এক পক্ষ হয় না। ইতিহাস তা বলে। ছোরাছুরির ধর্মই বুমারেং হওয়া। অবাধ ক্ষমতা যাঁদের হাতে থাকে অনেক সময় এ সত্যটা তাঁরা বুঝতে পারেন না, বুঝতে চান না। আজকের দিনই একমাত্র দিন নয় তার পরও মাস আছে, বছর আছে, যুগ আছে, বুমারেং হওয়ার অনন্ত অবসর কালের হাতে। ক্ষমতা জিনিসটা চিরকালই অন্ধ ও হ্রস্বদৃষ্টি—পরিণতি বুঝতে চায় না আদৌ।

অন্ধ ক্ষমতা আজ ছাত্র রাজনীতির এক অংশকে নাকি প্রশ্রয় দিচ্ছে, প্রশ্রয় দিয়ে বেপরোয়া করে তুলেছে ওদের। এ-প্রশ্রয়ের ফলে আজ ছাত্রদের হাতে দেখা দিয়েছে ছোরাছুরি, লোহার ডাণ্ডা আর হকি স্টিক্। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপককে লাঠি-পেটা করা হয়েছে, বিভিন্ন হল্ আক্রান্ত। মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার আর নার্সরা পর্যন্ত আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি। বিভিন্ন স্থানে বহু ছাত্র আহত হয়েছে। এ সব ব্যাপারে দেশের প্রশাসনযন্ত্র যথাযথভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে শোনা যায় নি। সরকার-সমর্থক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সম্মানিত বিভাগীয় অধ্যক্ষ একবার অত্যন্ত বেদনার সাথে আমাকে বলেছিলেন : 'যেদিন ছাত্ররা ডক্টর মাহমুদের উপর লাঠি তুলেছে সেদিনই আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ভরাডুবি হয়েছে।' তিনি এও বলেছিলেন : 'জীবিকার খাতিরে আমি ওখানে আজ চাকুরি করছি বটে কিন্তু আমার ছেলেমেয়েকে কখনো ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমি ভর্তি করাবো না।' আমার বিশ্বাস ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অধ্যাপকের আজ এ-ই মনোভাব। এ যেন তাঁদের জন্য দিনগত পাপক্ষয়।

অন্যায় বা পাপকে অঙ্কুরে বিনষ্ট না করে প্রশ্রয় দিলে তা সহস্রফণা হয়ে দেখা দেয়। এ ফণার দংশনেই সেদিন অকালে এক তরুণ জীবনের অবসান হলো। এ শোচনীয়তম ট্র্যাজিক ঘটনার কার্যকারণ আর তার অঙ্কুর কখন কিভাবে বপন করা হয়েছে, কর্তৃপক্ষ তা অনুধাবন করে দেখবেন কিনা জানি না। সমস্ত ঘটনা-পরম্পরা মানস-চক্ষে নিরীক্ষণ করে সূচনা থেকে এসবে পরোক্ষভাবে তাঁদের কোন দায়িত্ব আছে কিনা, থাকলে সে দায়িত্ব তাঁরা পুরোপুরি পালন করেছেন কিনা সরকার আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা বিবেচনা করে দেখলে ভবিষ্যতের জন্য ফল ভালই হতো। তাঁদের মনোভাব আর দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি ভুল ধরা পড়ে, আমাদের শিক্ষা-জীবন আর সভ্যতার খাতিরে তা সংশোধিত হওয়া উচিত। সংশোধনে কিংবা ভুল স্বীকারে কিছুমাত্র লজ্জা নেই। বিশেষত যেখানে গোটা সমাজ আর জাতির স্বার্থ বিপন্ন। এদল আর ওদল জাতি নয়, সব দল মিলেই জাতি। সে জাতির স্বার্থ রক্ষা করতে হবে নির্ভীক আর নিরপেক্ষ হাতে। নিরপেক্ষতাই সবচেয়ে বড় কথা। সব মূল্যের বিনিময়ে হলেও এ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হয়। সরকার বা প্রশাসকরা কোন দলের নয়। দলের হতে গেলেই দেশের সর্বনাশ। এখন সে সর্বনাশের আলামত্ ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যাচ্ছে বলেই আমাদের আশঙ্কা।

নির্বাচনের আগে মানুষ দলের থাকে—পরে শাসনকর্তৃত্ব যাঁরা লাভ করেন তাঁরা আর দলের থাকেন না, থাকা উচিত নয়। তাঁরা তখন সমস্ত দেশের, সমস্ত নাগরিকদের প্রতিভূ। বলা বাহুল্য, নির্বাচনে পরাজিত দলের স্বার্থেরও তাঁরা তখন জামিন। শাসকরা যদি দলীয় হয়ে পড়েন, সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করেন, তাহলে তাঁদের হাতে শাসন আর শাসন থাকে না—নির্যাতন আর শোষণ হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্র রাজনীতির বেলায় প্রাদেশিক শাসন-যন্ত্র নিরপেক্ষ নন বরং দলীয় পক্ষাপাতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন বলে এমন একটা গুজব যেখানে সেখানে এখন শোনা যায়, এ গুজব সত্য হলে এ যে বুমারেং-এর পথ রচনা তাতে সন্দেহ নেই। এখন ছাত্র রাজনীতি যে-শোচনীয় দশায় পৌঁছেছে তাতে সরকারী দায়িত্ব কতখানি তা সরকার পরিচালকদের ভেবে দেখা উচিত।

তাঁরা যদি সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ না হন তাহলে আমাদের শিক্ষা আর সাংস্কৃতিক জীবন দ্রুতযানে না চড়েও দ্রুত রসাতলে যাবে।

তিন

সরকারের ক্ষমতার উৎস যেখানেই থাকুক, যেখান থেকেই পরিচালিত হোক—সরজমিনে যাঁরা আছেন তাঁরাই সরকারী ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে থাকেন, করে থাকেন বাস্তবায়িত। বিশেষত যাঁরা প্রশাসনিক বিভাগে রয়েছেন আর যাঁরা জেলায় জেলায় শাসন-শৃঙ্খলাকে বজায় রাখেন তাঁদের উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল অনেকখানিই নির্ভর করে। তাঁরা যদি দায়িত্বশীল আর নিরপেক্ষ হন তাহলে শাসন-শৃঙ্খলা সহজে ভেঙে পড়তে পারে না। তখন মানুষ নিরাপদ মনে করে নিজেকে। তেমন অবস্থায় সরকার যে-দলেরই হোক শাসন-ব্যবস্থার প্রতি মানুষ একটা আনুগত্য বোধ না করে পারে না। তাঁরা দলীয় বা দলীয় মনোভাবের হয়ে পড়লেই দেশের জন্য বিপদ, তখনই দেখা দেয় আনুগত্যহীনতা। এভাবে রোপিত হয় অরাজকতার বীজ। শাসকদের উপর জনসাধারণের আস্থা না থাকলে কোন শাসন-ব্যবস্থাই সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। গায়ের জোরে কতটুকুই বা চালানো যায়? চালাতে গেলে অনেক ঝুঁকি নিয়েই চালাতে হয়। ফলে একদিন ডুবতে হয় স্বখাত সলিলে।

ঢাকায় যে-শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল শুধু নিন্দায় তার কোন প্রতিকার হবে না, যদি না সরকার আর ছাত্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। ছাত্ররা

এখন যে-রাজনীতি করছে এ রাজনীতি তাদের ছাড়তে হবে। কোন রকম রাজনীতিকেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। গোড়াতেই আমি সে কথা বলেছি। সরকারকে ছাত্র অ-ছাত্র সকলের ব্যাপারেই হতে হবে নিরপেক্ষ। সরকার নিরপেক্ষ হলে অনেক অশান্তির মূল উৎপাটিত হবে। ছাত্রদের মধ্যেও একটা সরকারী দল খাড়া করা শুধু-যে চরম অপরিণামদর্শিতা তা নয়, এ এক চরম নির্বুদ্ধিতাও। এর ফলে শাসন-শৃঙ্খলার দিক থেকে ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। হঠাৎ বিভিন্ন দলে গণ্ডগোল কি সংঘর্ষ দেখা দিলে, ইচ্ছা থাকলেও, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষরা যেমন তেমনি প্রশাসকরাও এ অবস্থায় পুরোপুরি নিরপেক্ষ হতে পারবেন না। ফলে অবস্থার সার্বিক অবনতি অনিবার্য। তখন অধ্যক্ষরা হন নিন্দিত। প্রশাসকরা হারান আস্থা।

অথচ সূত্র টানা হচ্ছে বহু দূর থেকে, যা অধ্যক্ষ কিংবা প্রশাসকদের নাগালের বাইরে। নিমিত্তের ভাগী করে এভাবে তাঁদের প্রতি করা হয় অবিচার। আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থা আজ এ এক অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন।

ঢাকার যে-শোচনীয় ঘটনার ইঙ্গিত আমি উপরে করেছি, অনেক জায়গায় তার নাকি অশুভ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। চট্টগ্রামও নাকি বাদ যায় নি, এখানেও নাকি অনেক নিরীহ ছাত্র আক্রান্ত আর প্রহৃত হয়েছে। সংবাদপত্রকে দেওয়া হয়েছে হুমকি। প্রশাসন-যন্ত্র নাকি এসব দমনের জন্য আশানুরূপ সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। সত্য হলে এসব খুবই দুঃখের আর লজ্জার কথা। দলমত-নির্বিশেষে সব ছাত্র যাতে নিরাপদ বোধ করে আর নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করে যেতে পারে তার পরিবেশ রক্ষা আর সৃষ্টির দায়িত্ব প্রশাসকদের। আমার বিশ্বাস জেলায় জেলায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত তাঁরা সবাই উচ্চশিক্ষিত। আমাদের মতো তাঁরাও দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ভালোবাসেন। কাজেই এ সব বিঘ্নিত হোক এ তাঁরা চান এ কথা ভাবা যায় না। চাকুরির বাইরে তাঁদেরও একটা ব্যক্তিসত্তা আছে, সেখানে সত্য, ন্যায় আর বিবেকের আহ্বানে তাঁরাও সাড়া দেন। এ দুয়ের সমন্বয় হলেই গভর্ণমেন্ট সার্ভ্যান্ট সহজে পাব্লিক সার্ভ্যান্ট তথা জন-সেবক হয়ে ওঠেন। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত পরিচয়ই অধিকতর গৌরবের।

আমরাও আমাদের প্রশাসকদের কাছে এটুকুই আশা করছি। আর ছাত্রদের কাছে আশা করছি প্রথম অনুচ্ছেদে আমি আমার যে-পক্ষ নির্দেশের উল্লেখ

করেছি তার প্রথমটি অন্তত তারা যেন মেনে চলতে চেষ্টা করে। তাহলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ফিরে না এসে পারে না। রাজনীতি করতে হয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বাইরে গিয়ে করো গে—তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। ছাত্র রাজনীতির যে-ভয়াবহ পরিণতি এখন দেখতে পাচ্ছি তাতে আমি বিচলিত বোধ না করে থাকতে পারছি না।

লেখার পণ্য-মূল্য

লেখা যে-কোন সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ। মানুষের পক্ষে প্রাগৈতিহাসিক আদিম অ-লেখার যুগে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। আক্ষরিক অর্থেই মানুষ এখন জ্ঞান-বৃক্ষের ফল-খাওয়া জীব। এ ফল অমৃত কিংবা বিষ যাই হোক না কেন, একদিকে এর চাষ, পরিচর্যা, অনুশীলন ও চর্চা—অন্যদিকে একে ভোগ, উপভোগ, হজম কিংবা আস্বাদন না করে মানুষের রেহাই নেই। চারদিকে এখন যে-সভ্যতা মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের অঙ্গ আর যে-সভ্যতা ভবিষ্যতের জন্য মানুষ কামনা করে, নিঃসন্দেহে তার প্রধানতম বাহন লেখা। লেখা ছাড়া সভ্যতা অকল্পনীয়, অভাব্য।

লেখার সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন, অবিচ্ছেদ্য। লেখক ছাড়া লেখা হয় না। নীরব কবির অস্তিত্ব হয়তো কল্পনা করা যায়, কিন্তু না-লেখা লেখক কল্পনায়ও আনা যায় না। অপরিহার্য ন্যূনতম প্রাথমিক প্রস্তুতিটুকু থাকলে যিনি সত্যিকারের লেখক তিনি না লিখে থাকতে পারেন না। তিনি যে-কোন অবস্থায় লিখবেনই, নিজেকে করবেনই প্রকাশ। লেখার মানে অবশ্য ইতর বিশেষ অনিবার্য, তা না ঘটে পারে না। মহাপ্রতিভাবানরাও এ স্বাভাবিক পরিণতির হাত এড়াতে পারেন নি। মানব-রচিত সব কিছুতেই গুণগত তারতম্য অনিবার্য। দীর্ঘকাল লেখার পণ্য-মূল্য স্বীকৃত না হলেও অতীতের স্থিতিশীল সমাজেও লেখকেরা পৃষ্ঠপোষিত আর প্রতিপালিত হতেন সমাজের দ্বারা। অর্থাৎ সমাজের বিত্তবান আর সচ্ছলরা সে দায়িত্ব বহন করছেন স্বেচ্ছায়। সমাজ এখন আর স্থিতিশীল নেই। সমাজ-বিবর্তন এখন অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত আর গতিশীল। জীবন-সংগ্রাম এখন কঠোর থেকে কঠোরতম পর্যায়ে এসে ঠেকেছে—ধর্মীয় থেকে অধর্মীয় সব কিছুই এখন পণ্য-মূল্যে বেচা-কেনা আর আদান-প্রদান প্রায় নিত্যকর্ম। দীনতম নিঃস্বের ঘরেও এখন মওলানা সাহেব বিনা পয়সায় মিলাদ পড়েন না। আমাদের এ 'পাক ওয়াতনে'ও বিনা পয়সায় এক কৌটা মদ কিংবা এক ছিলিম গাঁজা কোথাও পাওয়া যায় না। বরং শোনা যায়, এসবের

দাম এখন অনেক গুণ বেড়ে গেছে আগের তুলনায়। এসবই স্বাভাবিক, সব আপত্তিই এখানে অচল। কারণ আসলে মানুষ 'অর্থনৈতিক জীব'—যিনি ধর্মীয় ওয়াজনসিহত করেন তিনি যেমন, তেমনি যারা গাঁজা-মদ তৈয়ারী করে বা বেচা-কেনা করে তারাও। 'ইসলামিক রিপাবলিক' কথাটা লেখা খুবই সোজা, কলমের একটা আঁচড়ই যথেষ্ট। কিন্তু ইসলামের বিধি-নিষেধকে রাষ্ট্রীয় আইনের আয়ত্তে নিয়ে আসা শুধু কঠিন নয়, আধুনিক রাষ্ট্রের সাধ্যাতীতও। এ কারণে যাকে 'আদিম পেশা' বলা হয় যা সর্বতোভাবে ধর্ম-নিষিদ্ধ হলেও, পাকিস্তানে আজো তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নি। বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ রকম অজস্র স্ববিরোধিতার সম্মুখীন আমরা আজ। এ সবকে ডিঙিয়ে যাবার সাধ্য আমাদের কারো নেই।

তবে আশ্চর্য এটুকু যে, এ অবস্থায়ও আমরা অনেক সময় ভুলে যাই লেখকরাও মানুষ অর্থাৎ অর্থনৈতিক মানুষ, তেল-নুন-লকড়ির ভাবনার শিকলে তারাও বাঁধা। তাই লেখার-যে একটা দাম আছে বা দাম হতে পারে একথা অনেক সময় ভুলে থাকা হয়। আজকের দিনে সব কিছুরই পণ্য-মূল্য স্বীকৃত। বোধ করি এক লেখার ছাড়া। অবশ্য এটা আমার ঢালাও মন্তব্য নয়। ব্যতিক্রম সব কিছুরই আছে। অনেক পত্র-পত্রিকা এখন লেখার কিছু কিছু দাম দিয়ে থাকে। লেখার বদৌলতে যেখানে আয় বৃদ্ধি ঘটে সেখানে না দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। তবুও এমন অবস্থায়ও অনেকে দেন না। ছাপা বা মুদ্রণের অন্য সব প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য দেওয়া সকলেই আবশ্যিক মনে করে, কিন্তু সব রকম মুদ্রণ ব্যাপারের বুনিয়াদী বস্তুটির দাম দেওয়া আজো তেমন আবশ্যিক মনে করা হয় না। লেখকের 'অর্থনৈতিক' অস্তিত্বটা ভুলে থাকা আমাদের দেশে প্রায় রেওয়াজে পরিণত। 'মানপত্র' কি 'শুভেচ্ছা' লেখা, বিয়ের কি একুশের 'স্মরণিকা'য় লেখা দেওয়ার হাত থেকে বোধ করি খুব কম লেখকই রেহাই পান। প্রথম সামরিক শাসনের গোড়া থেকেই বোধ করি 'সংকলনে'র প্রবল মৌসুমী হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এখন লেখক আর বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য তা রীতিমতো এক উৎপাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে-কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিংবা প্রতিষ্ঠানের নামে 'সংকলন' বা 'স্মরণিকা' প্রকাশ করা এখন প্রায় অপরিহার্য প্রথা। আর এ সবের জন্য অকৃপণ হাতে খরচ করা হয় দেদার অর্থ—যার একটা নয়া পয়সাও লেখকের হাতে কি পাতে পড়ে

না। এদিক দিয়ে চিত্রশিল্পীরা ভাগ্যবান : প্রচ্ছদ বা বর্ণ কিংবা রেখা কি বৃত্ত যা-ই এঁকে দিক না কেন, তার জন্য তাঁরা মূল্য পান। বিয়ের চিঠির উপর একটা প্রজাপতি বা একটা পাল্কী কিংবা নর-নারীর হাও্‌শেকের একটা ছবি এঁকে দিয়েও নায্য দাম পেয়ে থাকেন তাঁরা। কিন্তু লেখকেরা বিয়ের চিঠি, শুভেচ্ছা, দীর্ঘ প্রীতি উপহার ইত্যাদি লিখে দিয়েও পান না একটা কানাকড়িও। অথচ এসব ছাই-ভস্ম মুদ্রণের বেলায় পয়সার কোন অভাব পড়ে না। শিল্পীরা তাঁদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন, এতে আমরা উৎফুল্ল। অনুরূপভাবে লেখারও পণ্য-মূল্য স্বীকৃত হোক এটাই আমাদের একমাত্র বক্তব্য। ছবি আর লেখা হাতের এপিঠ-ওপিঠ। এখানে ঈর্ষার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। শিল্পীদের প্রতি মোটেও আমরা ঈর্ষান্বিত নই। শিল্পী থেকে দফতরি সকলেরই শ্রমের মূল্য স্বীকৃত। কিন্তু লেখকের বেলায় ব্যবহারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ লেখা ছাড়া অভিনন্দনপত্র যেমন হওয়ার জো নেই, তেমনি 'সংকলন' কি 'স্মরনিকা'রও অস্তিত্ব অকল্পনীয়। ছবি কি শিল্পীরও প্রয়োজন দেখা দেয় লেখার পরে অর্থাৎ সর্বাগ্রে লেখা চাই, অথচ সে লেখারই মূল্য অস্বীকৃত।

কালি-কলম-কাগজ না হয় লেখক হওয়ার খেসারত হিসেবে দেওয়া গেল; কিন্তু দুঃখ হয় এমন বাজে কাজে সময় নষ্ট করতে হয় বলে। এক লেখক ছাড়া কাকেও বোধ করি এমন দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয় না। শুনেছি বিদেশে শব্দ গুণে, মুদ্রিত কলামের ইঞ্চি মেপে সব লেখার দাম দেওয়া হয়। সে সব দেশে লেখাকে পেশা হিসেবে নেওয়া একারণেই সহজ। আমাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রধান প্রধান সাময়িকীগুলিও অনেক সময় লেখার দাম দেয় না, মনে করে না দেওয়া উচিত। দেশের সাময়িকীগুলি বেঁচে বর্তে বেড়ে উঠুক, প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাক, এরকম একটা উপচিকীর্ষু আশা নিয়ে এ-ও হয়তো সহ্য করা যায় কিন্তু লেখা নিয়ে যেখানে রীতিমত ব্যবসা করা হয়, সেখানেও লেখার দাম না পেলে লেখকের পক্ষে দুঃখটা সীমাতীত হয়ে ওঠে না কি? তখন রাগ সামলানো দায় হয়ে পড়ে, প্রত্যাঘাতের একটা আদিম ইচ্ছাও হয়তো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু লেখকরা প্রকৃতিতে কিছুটা নির্বিরোধী বলে কপিরাইট আইন তাঁদের অনুকূলে হওয়া-সত্ত্বেও তাঁরা চুপ করে থাকেন অনেক সময়। আইন আদালত, আর উকিল মোক্তারের কাছে হাঁটাহাঁটি করা অনেকের স্বভাবে আর রুচিতে বাধে বলে নীরবে ক্ষতিটা সয়ে যেতে বাধ্য হন তাঁরা। এ ভাবে নিজেরা ঠকে

ঠকাবার বিদ্যাটা অন্যকে শেখান তাঁরা! কিন্তু ঠকা আর ঠকানো দু-ই তো অন্যায় আর নীতি-বিরুদ্ধ। লেখা নিয়ে যে-সব প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করে এ নীতি-বিরুদ্ধতাকেই ইদানীং তারা তাদের মূলধন করে নিয়েছে। লেখককে ঠকাতে কি ফাঁকি দিতে তাদের বিবেকে মোটেও বাধে না। এসবের জন্য মূলত আমাদের বড় বড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিই দায়ী। তারাই পয়লা নম্বরের আসামী। আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক স্কুল বোর্ড পাঠ্যপুস্তক সংস্থা ইত্যাদি নানা ধরনের সংকলন প্রকাশ করে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য বইগুলির অধিকাংশই সংকলিত। সংকলকদের অনেকেই লেখক নন, অনেকে স্রেফ কাঁচি-কাটা করেই কর্তব্য শেষ করেন। তার জন্য তাঁরা কয়েক হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক পান এও হয়তো অসমীচীন নয়। কিন্তু আপত্তি হচ্ছে সংকলিত লেখাগুলির জন্য লেখকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন পারিশ্রমিকই দেওয়া হয় না। এমনকি অনেক সময় লেখকের কাছ থেকে মামুলি অনুমতিটাও নেওয়া হয় না। এঁদের কাছে লেখাটা যেন এক বেওয়ারিশ মাল।

কাগজে দেখলাম এ বছর প্রায় দেড় লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। এতে অনুমান করা যায়, কোন কোন সংকলন তথা পাঠ্য বই লাখ লাখ কপিও বিক্রি হয়তো হয়েছে। নিঃসন্দেহে মুনাফাও এসেছে সে অনুপাতে। আই. এ., বি. এ.-তেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা লাখ না হলেও কয়েক হাজার তো বটেই। ঐ সব পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য বইও নিশ্চয়ই সে সংখ্যানুপাতেই বিক্রি হয়ে থাকে। কাজেই এ সব সংকলন-যে লাভজনক ব্যবসাদারী, তাতে সন্দেহ থাকার কোন কারণ নেই। তবে এ ব্যবসায়ে কাঁচা মাল সরবরাহকারী লেখকরাই হন এর লভ্যাংশ থেকে ষোল আনা বঞ্চিত। অথচ এ কাঁচা মালটুকু ছাড়া বই বা বই-এর প্রকাশনা আর তা নিয়ে ব্যবসা—কোনটাই চলে না। আশ্চর্য, এ মৌল সত্যটুকু কেউই বুঝতে চান না, চান না স্বীকার করতে। ততোধিক আশ্চর্যের ব্যাপার, লেখকদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যাঁরা এ ব্যবসাদারী করেন, তাঁরা সবাই শিক্ষিত আর বই-পড়া মানুষ। কেউ কেউ শিক্ষা দেন এবং নিজেরা বই বানানও। এসব বিজ্ঞ সংকলকদের কাছে এ ভাবে বিনানুমতিতে আর বিনামূল্যে লেখা প্রকাশের প্রশ্ন তোলা হলে তাঁরা নাকি এমন কথাও বলে থাকেন: সংকলনে লেখা নেওয়া হয়েছে এতেই তো লেখকদের কৃতার্থ বোধ

করা উচিত ; তার উপর আবার দামও ! লেখা আর লেখকের প্রতি এ হচ্ছে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের দৃষ্টিভঙ্গী ! শুনলাম, সম্প্রতি এক নাছোড়বান্দা লেখক এসব শিক্ষিত ব্যবসাদারদের কিঞ্চিৎ নাজেহাল করে ছেড়েছেন। প্রদেশের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয় আর এক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনী সংস্থাকে উকিলের নোটিশ দিয়ে তাঁর লেখা বিনানুমতিতে ছাপার জন্য মোটা খেসারত দাবী করেছেন তিনি। আইন লেখকের পক্ষে, তাই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আর পুস্তক প্রকাশনী সংস্থা অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো সুড় সুড় করে, বিনা বাক্যব্যয়ে ঐ লেখকের দাবী পূরণ করে দিয়েছেন। উকিলের চিঠিতে কাজ না হলে নিশ্চয়ই লেখক আইনের আশ্রয় নিতেন। নিলে উক্ত সংস্থা দুটি নির্ঘাত হেরে যেত। তদুপরি কথাটা রাষ্ট্র হলে অন্যান্য লেখকরাও এ নজিরের জোরে প্রত্যেকে ঐ পরিমাণ খেসারত দাবী না করে ছাড়তেন না। তখন লাভের সব গুড় মুহূর্তে বালি হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিতো। এখন গোপনে চুপে চুপে একজনকে তুষ্ট করেই খালাস। 'বুদ্ধিমানের মতো' কথাটা ব্যবহারের তাৎপর্য এখানে।

কিন্তু বুদ্ধি আর ন্যায়নীতি তো এক কথা নয়। সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। আমাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত সংস্থাগুলিতেও যদি ন্যায়নীতি অনুসৃত না হয় তাহলে সমাজে ন্যায়নীতি চিরকাল আকাশকুসুম হয়েই থাকবে। এক্ষেত্রে ন্যায়নীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হয়েছে বলে যে-সব লেখক নির্বিরোধী স্বভাবের জন্য বা উকিল কি আইনের আশ্রয় নেওয়া নিজেদের রুচিতে বাধে বলে তা করেন নি, মাঝখান থেকে তাঁরাই ঠকলেন অর্থাৎ তাঁদেরই ঠকানো হলো। তাঁদের লেখার কোন দামই স্বীকৃত হলো না, কোন দামই পেলেন না তাঁরা। উকিলের চিঠির কি অঘটন-ঘটন-পটু মহিমা ! মনে হচ্ছে এবার লেখকদেরও উকিল মোক্তারের মক্কেল না হয়ে উপায় নেই। যাই হোক, আমার এত কথার ইতিবৃত্ত এটুকু : সভ্য জীবন চাইলে লেখা ছাড়া আমাদের চলবে না আর লেখা চাইলে লেখার উৎপাদন-যন্ত্র লেখকটাকেও উপযুক্ত খোরপোষ দিয়ে বাঁচার সুযোগ দিতে হবে। লেখককে খোরপোষ দেওয়ার ভদ্র উপায় হচ্ছে লেখার দাম দেওয়া।

বিদেশী 'ইজম' কথাটার অর্থ কি

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নেতিবাচক ভূমিকা শুধু-যে অর্থহীন তা নয়, চরম বিভ্রান্তিকরও। রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আর সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। এ ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে হাঁ-বাচক অর্থাৎ অ্যাফারমেটিভ। এখানে নঞর্থক বা নেগেটিভ ভূমিকা গ্রহণ মানে কিছু না করা—স্রেফ কথার তুবড়ি বাজি ফোটানো। সম্প্রতি আমাদের কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নেতা-উপনেতারা এ-ই করতে শুরু করেছেন। তাঁরা জিকির তুলেছেন—এখানে বিদেশী 'ইজম' চলবে না। তাঁরা 'বজ্রকণ্ঠে' বিদেশী 'ইজমে'র বিরোধিতা করবেন, রুখে দাঁড়াবেন তার বিরুদ্ধে ইত্যাদি ইত্যাদি। ধর্ম-ভিত্তিক রাজনীতি যাঁরা করেন, তাঁরাই এ সম্পর্কে অধিকতর সোচ্চার, 'বজ্র-কঠিন শপথে'র কথাও তাঁরাই প্রকাশ করেন ঘন ঘন। আসলে এসবই ধার-করা বুলি—এর অর্থ তাঁদের অনেকেরই অজানা। 'সঙ্ঘ', 'সংগ্রাম', 'সংগ্রামী পরিষদ', 'বিপ্লব' প্রভৃতি শব্দ-যে সংস্কৃত আর সংস্কৃত-জাত আর সংস্কৃত-যে পূর্ব কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা নয়, এ সম্বন্ধেও বোধ করি তাঁরা না-ওয়াকিফ! আশ্চর্য, বিদেশী 'ইজম' এঁরা চান না, কিন্তু বিদেশী শব্দ আর পরিভাষা ব্যবহারে এঁদের কিছুমাত্র অরুচি নেই। আগে এঁরা 'জেহাদ' শব্দটা ঘন ঘন ব্যবহার করতেন, এখন বুঝতে পেরেছেন ঐ শব্দের প্রতি মানুষের আর তেমন কোন মোহ নেই, তাই এবার এঁরা সর্বতোভাবে সেকুল্যার 'সংগ্রাম' সাইন-বোর্ডের আড়ালে নিয়েছেন আশ্রয়! যদিও বিদেশী 'ইজমে'র মতো সেকুল্যারিজমকেও এঁরা একদম না-জায়েজ মনে করে থাকেন! এঁরা ইসলামী রাজনীতি করেন কিন্তু ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক। এঁদের এ স্ববিরোধিতার প্রতিই আমার আপত্তি, না হয় 'সংঘ', 'সংগ্রাম', 'বিপ্লব' ইত্যাদি শব্দের প্রতি আমার নিজের কিছুমাত্র অনীহা নেই। বরং ভাষার ব্যাপারে এঁদের মোহ-মুক্তি দেখে আমি আনন্দিত। ভাষাকে ধর্মের লেবাছ্ পরাবার কোশেশ-যে এঁরা ছেড়েছেন, বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য এ এক মস্তবড় সুখবর। নঞর্থক ভূমিকা আর স্ববিরোধিতার

এক বড় লক্ষণ চিন্তায় আর মননে বন্ধ্যাত্ব। এঁরা নতুন কিছু উদ্ভাবনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন এ যাবৎ। ফলে নামে শ্লোগানে সর্বত্র এঁদের ভাগ্য হয়েছে পরানুকরণ। যার নিদর্শন আমরা অহরহ আমাদের চারদিকে দেখতে এবং মাইকের মুখে শুনতে পাচ্ছি।

বিদেশী 'ইজম' কথাটার অর্থ কি? যার বিরুদ্ধে এঁরা সংগ্রাম করতে 'কছম' না খেয়ে 'শপথ' নিচ্ছেন? স্বদেশী 'ইজম'টিই বা কি? বিদেশী 'ইজম' অর্থে এঁরা বোধ করি একমাত্র সমাজতন্ত্রকেই বুঝিয়ে থাকেন। এঁদের বক্তৃতা আর বিবৃতি থেকে এটুকুই শুধু মালুম করা যায়। খাস স্বদেশী কোন্ 'ইজম'টা তাঁরা দেশে চালু করতে চান, তা কিন্তু এ যাবৎ খুলে বলেন নি। তাঁরা দলীয় রাজনীতি করেন, চান নির্বাচন ও গণতন্ত্র, চান ভোট ও পার্লামেণ্ট। জিজ্ঞেস করা যায়, এর কোন্‌টা স্বদেশী? এসবের জন্ম কি পূর্ব কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানে? ইসলামী রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁরাও-যে গণতন্ত্র চান—অন্তত মুখ রক্ষার জন্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এতেও বোধ করি সন্দেহ নেই যে, এ গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিদেশ থেকে আমদানি। এ গণতন্ত্র মানে সার্বজনীন ভোটাধিকার, ভোটার তালিকা, ভোটের গোপনীয়তা, নির্বাচন, নির্বাচনী এলাকা, নির্বাচন পরিচালক, পার্লামেণ্ট বা আইন পরিষদ, সংখ্যাপ্রধান ও সংখ্যালঘু, সরকার, ও বিরোধী দল ইত্যাদি। এ গণতন্ত্রের জন্মস্থান পাকিস্তান কি হিন্দুস্থান নয়। ইংল্যাণ্ড এবং এর জনক-জননী ইংরেজ। এ গণতন্ত্র কি বিদেশী 'ইজমে'র আওতায় পড়ে না? এ স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব আমাদের বিদেশী 'ইজম'-বিরোধীরা সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলেন। এ সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁরা যেন প্রয়োজন মনে করেন না। খাস স্বদেশী কোন্ 'ইজম'টাকে তাঁরা জায়েজ মনে করেন এবং কিভাবে তার সাহায্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠিত হবে, তারও বিশদ ব্যাখ্যা আবশ্যক। সে ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায় নি। কখনো পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না। কারণ আধুনিক গণতন্ত্রের চেহারা-ছুরৎ সব কিছুই সর্বতোভাবে বিদেশী হলেও এর বিরোধিতা করার হিম্মৎ-যে তাঁরা রাখেন না, এ আমাদের ভালো করেই জানা। তাহলে তাঁদের রাজনৈতিক জীবনেরই-যে ভরা-ডুবি ঘটবে, এ সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাই সবচেয়ে বেশী সচেতন! শুধু সমাজতন্ত্রই বিদেশী নয়, আমাদের জীবনের অনেক কিছুই বিদেশ থেকে নেওয়া। এখন বিদেশী মানে আধুনিক অর্থাৎ বর্তমান জীবনের সঙ্গে যা কিছু অচ্ছেদ্য তাই। এসবকে

পরিত্যাগ করা মানে আধুনিক জীবন-স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পেছনে পড়ে থাকা। এ কারণে বিদেশী জেনেও গণতন্ত্রকে ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না—সম্ভব হচ্ছে না 'ইসলাম দরদী'দের পক্ষেও। সমাজতন্ত্রেরও জন্মস্থান রাশিয়া কিংবা চীন নয়—একদিন ঐ দুই দেশেও সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ বিদেশী 'ইজম'ই ছিল—তবুও কেন ঐ দুই দেশ সমাজতন্ত্র গ্রহণ করেছে? গ্রহণ করেছে স্রেফ এ কারণে যে, তাতে ঐ দুই দেশের মানুষ তাদের জীবনের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে। যা কালক্রমে আজ ওদের নিজস্ব সম্পদে পরিণত—ওদের ধ্যান-ধারণা, আদর্শ আর জীবন-চেতনার সঙ্গে তা আজ এমনভাবে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে যে, স্বদেশী-বিদেশীর কোন প্রশ্নই কেউই তোলে না এখন ওখানে। ধর্মের ব্যাপারেও এ একই কথা বলা যায়—আমরা যে-ধর্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি, যে-ধর্মের অনেক কিছু আমাদের জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে তারও জন্ম ও উৎপত্তি বিদেশে। স্রেফ বিদেশী বলে যদি এ ধর্মকে পরিত্যাগ করা হতো, তাহলে আরব দেশের বাইরে বিশ্বের এক সুবৃহৎ জনসংখ্যা কি জীবনের এক অপূর্ব সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকতো না? কেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা এ ধর্মকে বিদেশাগত বা বিদেশ থেকে আমদানি মতবাদ বলে অস্বীকার করে নি? কারণ এ ধর্মে তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় চেতনার তথা আধ্যাত্মিক জীবনের খোরাক আর ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা সমাধানের পথ পেয়েছিল খুঁজে। জাগ্রতচিত্ত মানুষের কাছে দেশী-বিদেশী প্রশ্ন অর্থহীন। যা কিছু মহৎ, যা কিছু জীবনের উন্নয়ন ও বিকাশের সহায়ক তাকেই তারা দুই বাহু দিয়ে গ্রহণ করে। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও ইসলামকে সেভাবেই গ্রহণ করেছিল। রাশিয়া আর চীনও সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে ঐ দৃষ্টিকোণ থেকেই। আমি ধর্ম বা ইসলামের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের তুলনা করছি না। কারণ সমাজতন্ত্র কোন ধর্ম বা ধর্মপদ্ধতি নয়—রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক এক বিশেষ পদ্ধতিরই নাম সমাজতন্ত্র। তার সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস ও পারলৌকিক জীবনের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে পারলৌকিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক আর বিশ্বাস ছাড়া ধর্ম অকল্পনীয়। আমি শুধু একটা বিশেষ পদ্ধতি মানুষ কেন গ্রহণ করে, তা দেখবার জন্যই ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের উল্লেখ করেছি এখানে এক সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে গণতন্ত্রের নজিরও ফের উল্লেখ করা যায়। বলেছি গণতন্ত্র অর্থাৎ আধুনিক গণতন্ত্রও সম্পূর্ণ বিদেশী।

আমাদের পূর্বসূরী রাজনৈতিক নেতারা কেউ-ই অ-ধার্মিক ছিলেন না, তবুও বিদেশজাত এ অজুহাতে তাঁরা কেউ-ই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন নি। আর কখনো ইসলামকে ব্যবহার করেন নি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে। মুসলিম রাজনীতির সূচনা থেকে সব মুসলিম নেতাই গণতন্ত্রের দাবী জানিয়ে এসেছেন। এ দাবীর প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থরক্ষা। ধর্ম নিয়ে আমাদের কোন সমস্যা নেই, কখনো ছিল না। থাকলেও রাজনৈতিক পথে সে সমস্যা সমাধান হওয়ার নয়। আর তা কিছুতেই দৈশিক বা আঞ্চলিক হতে পারে না। কারণ ইসলাম বিশ্বধর্ম—বিশ্বের তাবৎ মুসলমানের সঙ্গে এ ধর্মের যাবতীয় সমস্যা আর তার সমাধান জড়িত।

আজ আমাদের একমাত্র সমস্যা রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক। বলা বাহুল্য, এ তিন এক সূত্রে গাঁথা এবং তা সর্বতোভাবে ঐহিক আর রাষ্ট্রের আয়ত্ত। এ তিনের যথার্থ সমাধান গণতন্ত্রের পথেই হবে, এ বিশ্বাসেই আমরা আমাদের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকেই গণতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি। রাজনৈতিক ক্ষমতা আর অর্থনৈতিক সমতা ছাড়া সামাজিক সমতা আসতে পারে না। এ তিন ক্ষেত্রে সমতা ছাড়া সমাজ-দেহ থেকে অবিচার অসাম্য আর শ্রেণীগত ব্যবধান দূর হওয়ার নয়। এখন 'যার আছে' আর 'যার নেই'···এ দু'য়ের মাঝখানে ব্যবধান প্রায় প্রশান্ত মহাসাগরীয়। ধর্ম এ ব্যবধান দূর করতে পারে নি। ইতিহাস তার জলজ্যান্ত সাক্ষী। বিদেশী কোন্ বস্তুটা আমরা গ্রহণ করছি না এখন? বিদেশী ভাষা, বিদেশী জ্ঞান, বিদেশী বিদ্যা এমন কি বিদেশী পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত আমরা গ্রহণ করতে দ্বিধা করি নি। কারণ আমরা জানি, এ ছাড়া আমাদের জাতীয় আর রাষ্ট্রীয় জীবনের অনেক কিছুই অচল হয়ে পড়বে। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করেছেন যে, ইংরেজীকে বাদ দিলে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। যোগাযোগ ছাড়া জাতীয় সংহতিও বা গড়ে উঠবে কি করে?

ধর্ম-ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও অনেক উকিল-ব্যারিস্টার আছেন, দেখছি, বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁরাও বিদেশী 'ইজমে'র মুণ্ডপাত করে থাকেন। অনেকে তা করে থাকেন ইংরেজী ভাষায় আর তখন তাঁদের গায়ে থাকে বিদেশী স্যুট আর গলায় থাকে টাই! এ কৌতুককর দৃশ্যটা বোধ করি অনেকেরই দেখা আছে।

অনেকে 'ইসলামী গণতন্ত্র'ই আদর্শ গণতন্ত্র এ দাবীও করে থাকেন। কিন্তু বর্তমান কি অতীত ইতিহাস থেকে এ গণতন্ত্রের কোন নজির তাঁরা দেখান নি বা দেখাতে পারেন নি আজো। খোলাফায়ে-রাশেদীনের পরে মুসলিম দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার কখনো কোথাও চালু ছিল বলে আমার জানা নেই। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তখন হয় উত্তরাধিকার-সূত্রে, না হয় 'জোর যার মুল্লুক তারে'র পদ্ধতিতেই হস্তান্তর হতো। মাবিয়া থেকে সে ইতিহাসের শুরু। মোগল-পাঠান যুগেও ঐ ধারাই অব্যাহত ছিল।

খোলাফায়ে-রাশেদীনরা গণ-ভোটে নির্বাচিত হন নি। সে নির্বাচন হতো হযরতের সাহাবা আর প্রধান প্রধান মুসল্লীদের সম্মতিতে। তখন খলিফারা ছিলেন আমিরুল মোমেনীন আর তাঁরাই ইমামতি করতেন মসজিদে। তাঁদের জীবনের 'পরহেজগারী'র দিকটার উপরই জোর দেওয়া হতো তখন বেশী করে। যাঁরা সব রকম বিদেশী 'ইজমে'র বিরোধী তাঁরাও এ পদ্ধতিতে নির্বাচন চান এবং প্রার্থীদের এ ধরনের গুণাবলী দাবী করেন তেমন কথা আজো শোনা যায় নি। করলে তা হতো অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। রাষ্ট্রপ্রধান যদি আমেরুল মোমেনীন আর তার উজির সভার সদস্যরা যদি শরীয়তের পুরোপুরি পাবন্দ না হন, তাহলে 'ইসলামী শাসন' কথাটা চিরকালই হাওয়াই বুলি হয়েই থাকবে।

একদিকে বিদেশী ধরনের গণতন্ত্রকে মেনে নেওয়া অন্যদিকে বিদেশী 'ইজমে'র বিরুদ্ধতা করা শুধু-যে স্ববিরোধিতা তা নয় এ এক রকম আত্মপ্রবঞ্চনাও। এ দু'য়ের কোনটাই সুস্থ রাজনীতির লক্ষণ নয়। আমি অন্যত্রও বলেছি ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মেশাতে গেলে এ পরিণতি না হয়ে যায় না। হয় পদে পদে গোঁজামিল দিতে হবে, না হয় নিজেকে এবং দেশের সরলবিশ্বাসী জনগণকে দিতে হবে ফাঁকি। তবে জেনে রাখা ভালো ফাঁকি কখনো দীর্ঘায়ু হয় না।

দুঃখটা এখানে যে, আগে মানুষ রাজনীতির নামে ফাঁকি দিতো, এখন ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মেশানোর ফলে, এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ধর্মের নামেও মানুষকে ফাঁকি দিতে শুরু করেছে। আমার বিশ্বাস এতে ধর্মের শাশ্বত পবিত্রতা যেমন ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তেমনি রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্যও হয় ব্যর্থ।

আমরা শুধু পাকিস্তানের নয় সারা বিশ্বেরও বাসিন্দা। যে-বিশ্বের সঙ্গে লেন-দেন ছাড়া কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

তাই বিদেশী 'ইজমে'র কথাটা আজ মূল্যহীন। বিজ্ঞান ছাড়া আজ কোন দেশের এক পাও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আর আধুনিক রাষ্ট্রনীতির মতো আধুনিক বিজ্ঞানও তো বিদেশ থেকেই আমদানি। শ্লোগান হিসেবে 'বন্যা-নিয়ন্ত্রণে'র কথা 'বিদেশী ইজম'-বিরোধীরাও বলে থাকেন বটে কিন্তু 'বন্যা-নিয়ন্ত্রণ' তো কিছুমাত্র 'ইসলামী' ব্যাপার নয়। · এর সমাধান নিহিত রয়েছে বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। যে-বিজ্ঞান শুধু-যে সেকুল্যার তা নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তার সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসের রয়েছে বিরোধ। নেতিবাচক ভূমিকা এ ভাবে পদে পদে বিভ্রান্তির পর বিভ্রান্তি ডেকে নিয়ে আসবে জাতির সামনে। শ্রমিক সমস্যাও-যে আজ স্থানিক নয়, বিশ্বের শ্রমিক সমস্যার সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা আর বিশ্ব শ্রমিক নীতি আর বিধি-বিধানের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত 'বিদেশী ইজম'-বিরোধীদের এ তথ্যটুকুও বোধ করি অজানা। তাই তাঁরা বিশ্বের শ্রমিকদের একমাত্র দাবী দিন 'মে-দিবস' পালনেরও বিরোধী! রাজনীতি, অর্থনীতি আর সমাজ-ব্যবস্থা-সম্পর্কে আজ বিশ্ব জুড়ে দেশে দেশে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, তার অন্যতম সমাজতন্ত্র, যার প্রধান নায়ক লেনিনের নামেও এঁরা ক্ষিপ্ত—এঁদের শ্লোগান 'লেনিন-দিবস পালন চলবে না' ইত্যাদি। এসব দিবস পালন করা মানুষের ইচ্ছাধীন। বাধ্যতামূলক নয় মোটেও। কিন্তু আমাদের ধর্ম-ভিত্তিক রাজনীতিবিদ্‌রা গায়ের জোরেই এ সবকেই বাধা দিতে চান। এখানেই আমাদের আপত্তি। ইসলামতন্ত্র যদি সমাজতন্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে আপন শ্রেষ্ঠত্বের জোরেই তা সমাজতন্ত্রকে পরাভূত করে ছাড়বে। বলা বাহুল্য, ডাণ্ডার জোরে কোন কিছুরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। সূর্য জানে যে সে চেরাগের চেয়ে অনেক বড় তাই চেরাগটাকে থাবা মেরে নিবিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন সে বোধ করে না।

আমাদের আশঙ্কা এ ধরনের নেতিবাচক রাজনীতি প্রশ্রয় পেলে আমরা বিশ্ব আর বিশ্বমানব সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো। বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে থাকবে না আমাদের কোন যোগাযোগ। ভিন্ন দেশের কোন মহৎ মানুষকে তখন আমরা করবো না কোন শ্রদ্ধা অর্থাৎ সব ব্যাপারে স্রেফ না, না, করতেই থাকবো। এ না-ধর্মী রাজনীতির শেষ পরিণাম কুয়ার ব্যাং বনে যাওয়া। ধর্ম-ভিত্তিক না-ধর্মী রাজনীতি কি আমাদের তাই বানাতে চায়?

রাজনীতি ও আলেম সমাজ

মানুষ শুধু মাত্র জৈবিক নয়। যুগপৎ আত্মারও অধিকারী। দেহের মতো আত্মারও ক্ষুধা আছে। অধিকন্তু আছে আশা-আকাঙ্ক্ষা, এষণা আর অভীপ্সা। তাই মানুষমাত্রেই অল্পবিস্তর আত্মজিজ্ঞাসু। সে চায় নিজের মধ্যে নিজে ডুব দিতে অল্পক্ষণের জন্য হলেও। এখানে সে স্বাধীন, অন্য-নিরপেক্ষ, সম্পূর্ণ মুক্ত। এখানে বিরোধের অনুপ্রবেশ ঘটলে আত্মা ভারসাম্য হারায়, মনের শান্তি আর সমাহিতচিত্ততা হয় বিপর্যস্ত।

ব্যক্তিগতভাবে যেমন তেমনি সামাজিকভাবেও মানুষের এমন একটি এলাকা রয়েছে (এবং থাকা উচিত), যা সব তর্ক, বিরোধ আর বাদানুবাদের উর্ধ্বে। অদৃশ্য আর ব্যবহারিক অর্থে অপ্রামাণ্য এমন এক সার্বিক আর অসীম শক্তির সঙ্গে মানুষের আত্মগত যোগাযোগ আর অভীপ্সা, শুধু-যে চিরন্তন তা নয়, ব্যক্তিবিশেষে তা দুর্বারও। এর ফলেই ধর্মীয় বিদ্যা ও আনুষঙ্গিক শাস্ত্র আর ওলী-দরবেশ ও মুনি-ঋষিদের আবির্ভাব। মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক না থাকলে তা কখনো এতখানি কালজয়ী আর এমন বিচিত্র হতে পারতো না। মনের যে-গভীর উপলব্ধি থেকে ধর্মের উৎপত্তি, সে মনের চেয়ে বিচিত্র-স্বভাব আর কিছু নেই। এ কারণেই ধর্মের এত বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও এত বৈপরীত্য আর এতখানি রকমফের। এমন কি একই ধর্মের মধ্যেও বৈচিত্র্য আর বৈপরীত্যের অন্ত নেই।

আমার বিশ্বাস, অনুষ্ঠান আর আচার বিচারের দিক দিয়ে ধর্ম বিচিত্র হলেও, মানুষের জীবনে ধর্মের ভূমিকা এক ও অভিন্ন। সে ভূমিকা একদিকে মানব-মনের গভীরতর উপলব্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি যেমন তেমনি অন্যদিকে মানুষের নিত্যদিনের হাজারো ব্যাকুলতা আর যন্ত্রণায় সান্ত্বনাও। তাই শোকে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, বিরহ-বিচ্ছেদে মানুষ ধর্ম আর ধার্মিকদের আশ্রয় খোঁজে। এখানে সব মানুষ তথা সব বিশ্বাসী এক—শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ এখানে রহিত। এখানে ঠাঁই দিতে গেলেই ধর্মের ভূমিকা হয় বিপর্যস্ত। সত্যিকার ধর্ম ও ধর্ম-জীবন

এক অখণ্ড শান্তির প্রতীক। তাই ধর্ম আর ধর্ম-জীবনের সাধকদের সব সময় তর্ক আর বিরোধের বাইরে থাকতে হয়। তা না হলে তাঁদের সাধনা যেমন বিঘ্নিত হয় তেমনি সমাজের সার্বিক কল্যাণ-সাধনও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণে অতীতে মুসলিম ধর্ম-সাধকদের অনেকে বড় বড় লোভনীয় প্রশাসনিক দায়িত্বও-যে প্রত্যাখ্যান করেছেন তার নজির ইসলামের ইতিহাসে বিরল নয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান সকলের জন্য, সমাজের অর্থাৎ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সব মানুষের জন্যই। কিন্তু ধর্ম আর ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া কিংবা গভীর আর ব্যাপকভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলাম পৌরোহিত্য স্বীকার না করলেও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব ইসলামের সূচনা থেকেই গড়ে উঠেছে। এবং এ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বিধান আর নির্দেশও অসন্দিগ্ধ। নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রে আলেম সমাজেরই অগ্রাধিকার।

সব সমাজেই দেখা যায়, একটা বিশেষ শ্রেণী শাস্ত্রকে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করে তার চর্চায় আত্মনিবিষ্ট থাকে সারাটা জীবন। বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নিয়ে এঁরাই সমাজের সামনে শাস্ত্রের ভাষ্য আর ব্যাখ্যা তুলে ধরেন আর নিজেদের জীবনকেও গড়ে তোলেন সে ভাবে। যাঁরা নিজের আর সমাজের কল্যাণার্থে এ গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁদের চরিত্র আর আচরণ হওয়া চাই সব বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে, হওয়া চাই সর্বজনমান্য ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আর ঐহিক ব্যাপারে নিঃস্বার্থ। তাঁদের প্রতিও থাকা চাই সমাজের সার্বিক শ্রদ্ধা আর আনুগত্য। মানুষের ধর্ম-জীবন এমন এক পবিত্র এলাকা যে, সেখানে তর্ক, বিরোধ আর সংঘর্ষের অনু-প্রবেশ ঘটলে তার পবিত্রতা আর শান্তিময় পরিবেশ কিছুতেই বজায় রাখা যায় না।

রাখা না গেলেও সমাজের ধর্ম-জীবনও রাজনৈতিক আখড়ায় তথা দলাদলি আর বিরোধের ক্ষেত্রে পরিণত হবে। লক্ষণ দেখে মনে হয় অচিরে আমাদের মসজিদ আর ঈদগাহ্গুলিও পরস্পর-বিরোধী শ্লোগানে হয়ে উঠবে মুখরিত। এমন কি ইদানীং দেখা যাচ্ছে কোন কোন মসজিদের ইমামও রাজনৈতিক বিতর্কে অংশ নিয়ে থাকেন। সমাজের পক্ষে এর চেয়ে অশুভ লক্ষণ আর ভাবা যায় না। ধর্মীয় এলাকায় বিরোধধর্মী কোন কিছুর আমদানি যেমন অবাঞ্ছিত তেমনি যাঁরা সমাজের ধর্ম-জীবনের দিশারী আর ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ তাঁদের পক্ষেও

উচিত নয় বিরোধমূলক কোন কিছুতে লিপ্ত হওয়া। লিপ্ত হলে শুধু-যে সমাজের ক্ষতি হবে তা নয় তাঁদের নিজেদের ক্ষতিও কম হবে না। প্রথমত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা তাঁরা হারাবেনই, সে সঙ্গে যে-ধর্ম-জীবনের ব্রতে তাঁরা ব্রতী তাঁদের সে জীবনও হবে পদে পদে বিঘ্নিত। সমাজের ধর্ম-জীবনের দিশারী হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার তখন তাঁদের আর থাকবে না। তাই দেখা যায় কোন দেশেই শাস্ত্রবিদ আর ধর্ম-জীবনে আত্মনিবেদিত ব্যক্তিরা বিরোধমূলক বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন না—ঐসব ব্যাপার থেকে সব সময় তাঁরা নিজেদের রাখেন নিরাপদ দূরত্বে। জাগতিক ব্যাপারে এঁদের নির্লিপ্তি ধর্মক্ষেত্রে কম ফলপ্রসূ হয় নি। প্রত্যেক ধর্মকে কেন্দ্র করে যে-বিরাট শাস্ত্র আর ধর্মীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছে, আমার বিশ্বাস এর ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের ধর্ম-জীবনের দিশারী আমাদের আলেম সমাজ, এ সম্বন্ধে তাঁদের যোগ্যতা ও অধিকার নিঃসন্দেহ। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা আর প্রস্তুতিও এ জীবনেরই উপযোগী। তাঁদের অভিজ্ঞতাও এ ক্ষেত্রেই সীমিত। এখানে তাঁরা সমাজের প্রভূত খেদমৎ অতীতে যেমন করেছেন এখনো-যে না করছেন তা নয়। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলে তা সম্ভব হবে না বলেই আমার আশঙ্কা। বর্তমানে এক শ্রেণীর আলেম সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছেন বলেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। আমার বিশ্বাস এর পরিণাম সমাজের পক্ষে মোটেও শুভ হতে পারে না। বরং অচিরে এ সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সমাজের যে-এলাকাকে আমরা সব-রকম বিরোধ বিতর্কের বাইরে রাখতে চাই, রাখা প্রয়োজন মনে করি, আলেম সমাজ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলে তা রাখার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হবে। তখন সে পবিত্র এলাকায়ও দেখা দেবে বিরোধ, বিতর্ক, সংঘাত ও সংঘর্ষ। সর্বস্তরের মুসলমানের সেই শান্তির এলাকাটিও তখন আর থাকবে না শান্তির এলাকা। সমাজের ধর্ম-শিক্ষা আর ধর্ম-জীবনের দিক থেকে এ হবে সবচেয়ে বড় ক্ষতি। রাজনৈতিক ক্ষমতা এ ক্ষতি কখনো পূরণ করতে পারবে না। তখন মসজিদেও দেখা দেবে দল, মক্তব মাদ্রাসায়ও রাজনৈতিক বিশ্বাস আর মতাদর্শ অনুসারে গড়ে উঠবে পরস্পর-বিরোধী ফেরকা বা উপদল। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিরোধ আর সংঘর্ষ।

আমি অন্য এক প্রবন্ধে বলেছি ধর্ম স্বভাবে মিলনধর্মী ; ধর্ম মানুষকে সংঘবদ্ধ করে সম-বিশ্বাসীদের একই ক্ষেত্রে, একই মঞ্চে মিলায়, মিলনে সহায়তা করে।

রাজনীতি কিন্তু স্বভাবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজনীতির চরিত্র বিরোধধর্মী। বিশেষত গণতান্ত্রিক রাজনীতি দলভিত্তিক বলে তাতে দলে দলে বিরোধ আর বিভেদ অনিবার্য। এ কারণে পাকিস্তান মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র হলেও আর পাকিস্তানের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল মুসলমানদের দ্বারা গঠিত আর পরিচালিত হলেও এক দলের সঙ্গে অন্য দলের মিল নেই, মিল হচ্ছে না। এমন কি ইসলামের নামে যে-সব রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে সে সব দলের মধ্যেও পারস্পরিক মিল-মহব্বৎ ও ঐক্য-বোধ অনুপস্থিত। এবং এদেরও এক দল অন্য দলকে মনে করে শত্রু। এমন কি পরস্পরের বিরুদ্ধে 'কাফেরী' ফতোয়াও বিরল নয়। দেখে অবাক হতে হয় এ ফতোয়া দিচ্ছে মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে, এক আলেম অন্য আলেমের বিরুদ্ধে! ধর্ম নিয়ে এর চেয়ে নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে? রাজনীতি স্বভাব-চরিত্রে বিরোধ-ধর্মী বলে এ না ঘটে পারে না। 'ইসলামী ভ্রাতৃত্বে'র শ্লোগান কিংবা 'কোরান-সুন্না'র দোহাই এ বিরোধ কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না। ইসলামের জন্মভূমি খাস আরব দেশে তা ঠেকানো যায় নি। সেখানে এক ধর্মাবলম্বী এক ভাষাভাষী এক জাতি ভেঙে আজ বারো জাতিতে পরিণত। এর মূলে রাজনীতি আর রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছাড়া দ্বিতীয় কোন কারণ নেই। আমাদের দেশেও আলেম সমাজ-যে আজ বিভক্ত হয়ে পড়েছেন তারও কারণ রাজনীতি। রাজনীতিতে তাঁদের একটা অংশ দল বা পক্ষ নেওয়ার পর থেকেই এ বিভেদ আর বিরোধের সূচনা। এর আগে আলেমদের মধ্যে এমন দল-ভিত্তিক বিরোধ আমরা কখনো দেখি নি। তখন শাস্ত্রীয় মসলা-মসায়েল নিয়ে যে-বিরোধ ঘটতো তা ছিল অনেকখানি কেতাবী আর অতি স্বল্প-সংখ্যকের মধ্যে সীমিত। তার সঙ্গে বৃহত্তর জনতার কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু রাজনীতি তো তা নয়। রাজনীতি আজ সর্বতোভাবে জন-জীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। সার্বজনীন ভোটাধিকার যেখানে স্বীকৃত সেখানে রাজনীতি কিছুতেই ঘরোয়া কিংবা স্রেফ কেতাবী হয়ে থাকতে পারে না। সমাজের সর্বস্তরে এ রাজনীতির প্রতিক্রিয়া এক ভাবে না এক ভাবে হবেই—ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য নেই কারো। আলেমেরা যদি এমন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন তাহলে তাঁরাও 'দলীয়' না হয়ে পারবেন না। তখন সমাজও তাঁদের গ্রহণ করবেন 'দলীয় মানুষ' হিসেবেই—ধর্ম-জীবনের দিশারী কিংবা প্রতিভূ হিসেবে নয়। যে-সমাজে নানা দল রয়েছে, রয়েছে নানা দলের অনুসারী

মানুষ সে সমাজে রাজনৈতিক আলেমরা কখনো সমাজের সার্বিক শ্রদ্ধা আর আনুগত্য আশা করতে পারেন না। আমার বিশ্বাস ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য এ শ্রদ্ধা আর আনুগত্যটুকু অপরিহার্য। অতীতে আলেম সমাজ যখন রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতেন তখন তাঁদের প্রতি জনগণের যে-শ্রদ্ধা আর আনুগত্য ছিল তা ছিল সর্বতোভাবে আন্তরিক নির্ভেজাল ও সার্বজনীন। সেদিন সত্যিকার অর্থে তাঁরা সমাজের সামনে শুধু-যে ধর্ম-জীবনের আদর্শ ছিলেন তা নয়, দলমত-নির্বিশেষে সকলের ভক্তির পাত্রও ছিলেন। আমি জোর করে বলতে পারি কোন রকম রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলে, এমন সম্মানের পাত্র তাঁরা কখনো হতে পারতেন না।

ধর্মীয় রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ নাকি হযরত রসুলে করিমের দোহাই দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, রসুলে করিমের যমানার রাজনীতি আর এখনকার রাজনীতি এক নয়। তখন দলীয় রাজনীতির অস্তিত্বই ছিল না। ইসলামে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে 'খোরেজিদে'র আবির্ভাবের পর থেকে আর তা ঘটে রসুলে করিমের ইন্তেকালের বহু বছর পরে চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর সময় আর তার মর্মন্তুদ পরিণাম ইসলামের ইতিহাস-পাঠকদের অজানা নয়। অধিকন্তু তখনকার রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন 'আমিরুল মোমেনীন'—এখন রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তাঁর উজির সভার কেউ-ই 'আমিরুল মোমেনীন' নন্। কাজেই তখনকার রাজনীতির সঙ্গে এখনকার রাজনীতির কোন তুলনাই চলে না। এখন রাজনীতি এক জটিল ব্যাপার আর তা মোটেও সীমিত নয় কোন ভৌগোলিক সীমায়, সারা বিশ্বের সঙ্গে এ রাজনীতির এখন গাঁট-ছড়া বাঁধা।

এ কারণে আমাদের কোন কোন ধর্ম-ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমাজতন্ত্রকে 'কুফরীর সমতুল্য' ঘোষণা করলেও তার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান আর সৈন্যাধ্যক্ষরা সমাজতান্ত্রিক দেশে শুধু-যে সফর করছেন তা নয়, নিচ্ছেন সে সব দেশ থেকে নানা রকম সাহায্য, আবদ্ধ হচ্ছেন নানা চুক্তিতে সে সব দেশের সঙ্গে। কই এ সবের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ তো সোচ্চার হতে শোনা যায় না। 'শক্তের ভক্ত আর নরমের যম' নীতি কোন সৎ-ধার্মিকের লক্ষণ নয়। 'সমাজবাদ', 'পুঁজিবাদ', 'মাওবাদ' চলবে না এমন শ্লোগান আউড়ানো অতি সহজ কিন্তু যে-সব দেশে ঐ সব 'বাদ' চলছে তার সঙ্গে

সম্পর্কচ্ছেদ ভিন্ন কথা। আধুনিক রাষ্ট্র আর নীতির পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। এ সত্য সমাজতন্ত্র-বিরোধীদেরও-যে জানা নেই তা নয়, জানা আছে বলেই তাঁরা আজো সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে 'আদর্শভিত্তিক' রাষ্ট্র পাকিস্তানের সম্পর্কচ্ছেদের ধুয়া তোলেন নি। তাঁরা এও ভালো করেই জানেন, তুললেও কেউ তার প্রতি কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করবে না। আলেম সমাজ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলে এ রকম স্ব-বিরোধিতার শিকার তাঁরা না হয়ে পারবেন না। বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম তথা শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বিরোধ এত বেশী যে, এ দু'য়ের মিলন কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই আলেম সমাজের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আমি বিরোধী। অংশ গ্রহণ করলে রাজনীতির কোন ফায়দা তো হবেই না অধিকন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদিতেও অনিবার্য ভাবেই দেখা দেবে বিরোধ, বাদানুবাদ ও সংঘর্ষ। দলীয় রাজনীতি তাঁদেরও দলীয় আলেম বানিয়েই ছাড়বে। দল হলে বা থাকলে দলাদলিও-যে হবে এ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। তখন মসজিদে, জুমার নামাজে, মিলাদ শরিফে এবং ঈদগায়ও দেখা দেবে বিরোধ আর সংঘর্ষ। যার সূচনা ইতিমধ্যেই লক্ষগোচর। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এখন দেশের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আলেমদের ব্যবহার করছে নিজেদের দলীয় স্বার্থে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমার বিশ্বাস অগোণে এক দলের আলেমের পেছনে, তিনি যতই যোগ্য হোন না কেন, অন্য দলের সমর্থক মুসল্লীরা, নামাজ পড়তে আপত্তি করে বসবে। প্রত্যেক দলের আলেম আর মুসল্লী সম্বন্ধেই একথা বলা যায়। ধর্মীয় দলগুলি তো আরো জঙ্গী। তাঁদের বেলায় বিরোধটা হবে অধিকতর তীব্র ও মারাত্মক। এভাবে দলাদলির সম্প্রসারণ ঘটবে ধর্মীয় এলাকায়ও।

আগেই বলেছি ধর্মীয় এলাকাটা সব সমাজের সব জাতির এমন একটা মুক্ত ও পবিত্র এলাকা যে, সেখানে রাজনৈতিক মতামত-নির্বিশেষে সমাজের সব মানুষের নির্ভয়ে সরল মনে আর বিনা দ্বিধায় প্রবেশ আর অংশ গ্রহণ করতে পারা চাই। পারা চাই সহজ ও নিষ্কলুষ মনে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে পরস্পরের সঙ্গে দিল খুলে মেলামেশা করতে। রাজনীতি সেখানেও মাথা গলালে এ সম্ভব হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। অন্তত এ একটা ক্ষেত্রে কোন রকম বিতর্ক-মূলক বিষয়ের অনুপ্রবেশ না ঘটুক এ আমি চাই।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনীতিকে প্রবেশ করতে দিয়ে আমরা নিজের হাতে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শান্তি নষ্ট করেছি। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যদি রাজনীতিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় এখানেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কেউ-ই রুখতে পারবে না।

পাকিস্তানী জাতীয়তার বুনিয়াদ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে আমরা এ উপমহাদেশের মুসলমানেরা ছিলাম একটা সম্প্রদায় মাত্র—নিঃসন্দেহে সংখ্যা আর সংস্কৃতির দিক দিয়ে খুব শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়। স্বাধীনতার পর আমরা রাতারাতি একটা পূর্ণাঙ্গ জাতিতে পরিণত হয়েছি আর হয়েছি এক সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক। প্রশ্ন করা যায়, মুসলমানরা পাকিস্তান বা নিজেদের একটা পৃথক রাষ্ট্রের দাবী তুলেছিল কেন? আমার বিশ্বাস, ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখা কিংবা তথাকথিত ইসলামী সংস্কৃতির জন্য এ দাবী উত্থাপন করা হয় নি। প্রধানত এ দাবী ছিল সে যুগের ভারতীয় মুসলমানদের নিরাপত্তা—যা সাধারণভাবে 'মুসলিম স্বার্থ' নামে অভিহিত হতো, তা সংরক্ষণের জন্যই—যা মোটামুটি ধর্ম-নিরপেক্ষ আর পরিধি যার বহু ব্যাপক। ধর্মও অবশ্য তার অন্তর্গত। অবিভক্ত ভারতে ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। অধিকন্তু ভারতের সর্বত্র আমাদের বহু ধর্মীয় শিক্ষা আর সংস্কৃতি-চর্চার কেন্দ্র ছিল, যেমন আলীগড়, সাহারনপুর, দেওবন্দ, রামপুর, নদওয়াতুল ওলেমা, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা আলীয়া এবং বিভিন্ন স্থানের ইসলামিয়া কলেজসমূহ। আমার এও বিশ্বাস, সত্যকার ধার্মিক ব্যক্তি প্রতিকূল পরিবেশেও নিজের ধর্মকর্ম করে যেতে পারেন, যেমন অতীতে মুসলিম আওলিয়া-দরবেশরা করে গেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রে ধর্মের তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলেও আমার মনে হয় না। সে ভূমিকা এখন নিয়েছে রাজনীতি আর অর্থনীতির যোগফল। রাজনীতি-প্রাজ্ঞ কায়েদে আজম এ সত্য বুঝতে পেরেছিলেন—তাই তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনও 'ইসলাম বিপন্ন' এ ধুয়া তোলেন নি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় প্রধানতম শ্লোগান ছিল 'ভারতীয় মুসলমানরা বিপন্ন'—বিপন্ন রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে, ধর্মীয় সত্তার দিক থেকে নয়। কায়েদ নিজেও ছিলেন প্রথম নম্বরের গণতন্ত্রমনা আর সার্থক পার্ল্যা-মেন্টেরিয়ান; কাজেই তাঁর বুঝতে এতটুকু দেরি লাগে নি যে, স্বাধীন ভারতের

রাজনৈতিক কাঠামো গণতান্ত্রিক না হয়ে যায় না। সে গণতন্ত্রে ভারতীয় মুসলমানরা এক অসহায় সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে আর থাকবে তা হয়ে চিরকাল।

যে-দেশে ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘু নির্ধারিত আর বিভক্ত, সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এ উপলব্ধির ফলেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ থেকে কায়েদের উত্তরণ সহজ হয়েছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদে। যে-কোন সম্প্রদায় বা জাতি আর রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ভিত্। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এ দুই ক্ষেত্রে মুসলমানরা ছিল অনেকখানি কোণঠাসা হয়ে, ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তাদের পেছনের সারিতে। যখনই কোন একজন মুসলমানকে কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হতো, দেখা গেছে তখনই আপত্তি আর প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যেতো। উপযুক্ত ও সর্বতোভাবে যোগ্য মুসলমানকে ভাইস্-চ্যান্সেলর কিংবা করপোরেশনের মেয়র এমনকি অধ্যাপক-অধ্যক্ষের পদ দেওয়া হলেও সাম্প্রদায়িকতার তুমুল তুফান বয়ে যেতে দেখেছি আমরা। অবনীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের স্বপারিশে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর মতো খ্যাতনামা শিল্প-বোদ্ধা ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ললিতকলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়, তখন তাঁর বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সব পত্রিকা একজোটে তুমুল আন্দোলন করে দেশের আকাশ-বাতাস বিষিয়ে তুলেছিল, এ দৃশ্যও আমাদের অনেকের দেখা। স্যর আবদুর রহিমকে যখন বাংলার গবর্নর মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন কোন হিন্দু নেতাই তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হন নি, তাঁকে পুরোপুরি বর্জন করা হয়েছিল সেদিন। এভাবে ব্যক্তিগতভাবে শুধু তাঁকে নয়, সমস্ত মুসলমান সমাজকে করা হয়েছে হেয় ও অপদস্থ। সেদিন প্রত্যেক মুসলমানই এ অপমানে মর্মে মর্মে বেদনাবোধ না করে পারে নি। এ যদি বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাপ্রধান প্রদেশে সম্ভব, তাহলে ভবিষ্যতে, যে-সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে তাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে? কেন্দ্রে তো অবস্থা আরো শোচনীয় হওয়ার কথা। কারণ সেখানে তাদের সংখ্যালঘুত্ব কোন দিনই ঘোচবার নয়। অবশ্য প্রদেশে আর কেন্দ্রে মুসলিম মন্ত্রী-যে থাকবে না তা নয়, তবে তাঁরা মুসলিম প্রতিনিধি হবেন না, হবেন যে-সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় তাঁদের

মনোনীত করবেন, তাঁদেরই প্রতিনিধি ও মুখপাত্র। ফলে বৃটিশ আমলে এতকাল যেটুকু রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব মুসলমানরা ভোগ করে এসেছে, ধীরে ধীরে তার থেকেও তারা হবে বঞ্চিত। বলা বাহুল্য, এ দুয়ের বিয়োগ-ফলে অবস্থা যা দাঁড়াবে, তাকে এক কথায় বিয়োগান্তই বলা যায়। আত্মসম্মান রক্ষা করে অস্তিত্ব রক্ষা তাদের পক্ষে সত্যই দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো সে অবস্থায়। পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরাই তার নজির। এক অত্যন্ত যোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বের পরিচালনায় মুসলমানরা অবিভক্ত ভারতে তাদের-যে এ অবস্থা দাঁড়াবে, তা যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন সেদিন। দীর্ঘ দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তা বুঝতে তাদের কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় নি আর লাগে নি দীর্ঘ সময়ও।

এভাবের পটভূমিতেই পাকিস্তানের জন্ম ও সৃষ্টি। এর পেছনে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক বিবেচনা যতখানি সক্রিয় ছিল ধর্ম কিংবা সংস্কৃতি-চেতনা ততখানি ছিল বলে আমার মনে হয় না। মনে পড়ে কংগ্রেস কিংবা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে যতবার যত আলাপ-আলোচনাই হয়েছে কায়েদে আজম তাতে কখনো ইসলাম বা মুসলিম সংস্কৃতির কথা তোলেন নি। তিনি সব সময়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাবী করেছেন, রাজনৈতিক স্তরে সংখ্যাসাম্য ও সুবিচার। কংগ্রেসের সঙ্গে শেষবারের মতোও যে-আলোচনা ব্যর্থ হলো তাও এ দাবীর প্রশ্নেই। তিনি যেমন জানতেন, তেমনি আমরাও জানি, আধুনিক রাষ্ট্রে সব শক্তির মূল উৎস রাজনৈতিক ক্ষমতা। অর্থনৈতিক ক্ষমতা বা অবস্থাও রাজনৈতিক ক্ষমতার উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল। কায়েদে আজম নিজেও আপাদমস্তক-যে রাজনীতিবিদ ছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর এও সত্য যে, প্রচলিত অর্থে তিনি ধার্মিক ছিলেন না কখনো। তাই সূচনা থেকেই তিনি পাকিস্তানকে আধুনিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন সে আদর্শই। তিনি জানতেন এ আণবিক যুগে ধর্মকে যে-কোন রাষ্ট্রের বুনিয়াদ করতে বা বলতে যাওয়া স্রেফ আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই না। এমন সব আধুনিক রাষ্ট্রকেই সুষ্ঠু রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক নীতি আর বিচার-বিবেচনাকেই দিতে হবে অগ্রাধিকার। বলা বাহুল্য, আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানেরও এছাড়া গত্যন্তর নেই। যাঁরা রাষ্ট্রকে ধর্মভিত্তিক আর ধর্মীয় নীতিতে চালাবার দাবী

করেন, তাঁদের উচিত সঙ্গে সঙ্গে এ দাবীও উত্থাপন করা যে, আমাদের শাসক আর প্রশাসকরা সবাই ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন—আর মাদ্রাসা আলীয়া বা ঐ ধরনের ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলো থেকেই ঐসব পদে করা হোক লোক নিয়োগ। কিন্তু তেমন দাবী তাঁরা আজও করেন নি। অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রেও তা করা হয়েছে বলে শোনা যায় নি। ইসলামের জন্মস্থান সৌদী আরবও তা করে নি। এ থেকে বোঝা উচিত, আধুনিক রাষ্ট্রে শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শীর চেয়েও রাজনীতি আর অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন অনেক বেশী। এ ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্র অচল। গ্রাণ্ড মুফতিকে নেতা বানিয়ে প্যালেস্টাইনবাসীরা কি ঠকা ঠকেছে, তার নজির আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। তার সঙ্গে কায়েদে আজমের নেতৃত্ব তুলনীয়। এখানেও বিরুদ্ধশক্তি কম প্রবল ছিল না। যে-সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চরিত্র আর স্বভাবে এবং পাঠ্য-সূচীতে পুরোপুরি সেকুল্যার বা ধর্মনিরপেক্ষ; এ যাবৎ আমাদের যত প্রশাসনিক অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন, যাঁরা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক যন্ত্রকে চালু রেখেছেন, তাঁরা সবাই ঐসব প্রতিষ্ঠান থেকেই আমদানি। কায়েদে আজম থেকে শুরু করে বর্তমান প্রেসিডেন্ট বা কায়েদে মিল্লাত থেকে শেষ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সবাই ঐরকম শিক্ষা আর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরই ফসল। ধর্ম আর শাস্ত্র যে-সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁরা কেউ আসেন নি তেমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে বা তেমন শিক্ষার ঐতিহ্য নিয়ে। আধুনিক শিক্ষা আর আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ছাড়া কারো পক্ষে দক্ষতার সাথে আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচল রাখা সম্ভব নয়। স্রেফ শাস্ত্রবিদ মৌলবী মওলানা দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক যন্ত্রকে যথাযথভাবে চালু রাখা আদৌ যায় কিনা সন্দেহ। তাই যাঁরা একদিকে দাবী করেছেন পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে হবে সর্বতোভাবে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে, আবার সেই সঙ্গে দাবী জানাচ্ছেন এ রাষ্ট্রের বুনিয়াদ হবে ইসলাম ও ইসলামিক নীতি, তাঁদের কথা আর দাবীতে যুক্তি ও সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এও প্রশ্ন করা যায় রাষ্ট্র কি ইসলামী নীতি বা নির্দেশ-মালাকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম? সত্য কথা, মিথ্যা না বলা, চুরি না করা, কাকেও খুন না করা, কিংবা সুবিচার করা এর কোনটাই একচেটিয়া ইসলামী নীতি নয়। ইসলামের আগেও এসব বিধি-নিষেধ ছিল। কোন ধর্মেই এসবের বিপরীত নির্দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব রাষ্ট্রের

আইন আর বিচারপদ্ধতিতেও এসব বিধি-নিষেধ স্থান পেয়েছে; এমনকি নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্রেও মিথ্যা ও চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি অপরাধ বলে গণ্য এবং তার জন্য বিচার আর কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্বের তাবৎ রাষ্ট্রেরই বিচারপদ্ধতি আর আইনের মূল লক্ষ্য নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচার। কাজেই এসব নীতি মোটেও আমাদের খাস সম্পদ নয়, নয় একচেটিয়া ব্যাপার।

ইসলাম কি? এক আল্লায় বিশ্বাস করা আর হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) শেষ নবী বলে মানা। ইসলামের এ মূল বিধান, এছাড়া কেউই মুসলমান বলে গণ্য হতে পারে না। এর বাইরে আরো কিছু বাধ্যতামূলক নির্দেশ রয়েছে, যেমন দিনে রাতে পাঁচ বার নামাজ আদায় করা, রমজানে রোজা রাখা, যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁদের হজ্ব করা, উদ্বৃত্ত ধনের জাকাত দেওয়া ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস, এর কোনটাই রাষ্ট্রের আয়ত্তে বা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। একমাত্র জাকাত-কেই হয়তো আয়কর আইনের আওতায় এনে কিছুটা বাস্তবায়ন করা যায়। অন্যগুলি ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে জড়িত যে, মানুষের মৌলিক অধিকারের উপর হামলা না করে তা কিছুতেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা এক রকম অসম্ভব বললেই চলে।

অধিকন্তু রাষ্ট্রের মতো ধর্ম তো আঞ্চলিক বা দৈশিক নয়। বিশেষত ইসলাম সর্বতোভাবে বৈশ্বিক আর সর্ব-মানবিক। তাই রাষ্ট্রকে ইসলাম-ভিত্তিক করা শুধু পাকিস্তানের সমস্যা নয়, অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রও যদি এ দায়িত্ব না নেয় তাহলে ইসলামের দিক থেকে বিশেষ ফায়দা হবে বলে মনে হয় না। আমার এও বিশ্বাস, ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো ব্যক্তি-জীবনকে উন্নত, সুন্দর ও মহৎ করা আর এ সম্ভব তখন, যখন ধর্ম ব্যক্তি-জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে, রূপ নেয় ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনে। এ না করে ধর্মকে রাষ্ট্রের ঘাড়ে চাপানো মানে একের কাজকে দশের কাঁধে তুলে দেওয়া। তেমন অবস্থায় ধর্মও অন্য দশটা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের মতো স্রেফ পোশাকী না হয়ে যায় না। আর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দুর্নীতি তো সর্বজনবিদিত।

ঐক্যের নামে যে-ধর্মের উল্লেখ করা হয়, তা অতীতে সব দেশেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এখনো সে প্রমাণের কোন অভাব নেই। মাবিয়া-এজিদ আর হাসান-হোসেনও মুসলমান ছিলেন। খ্রীস্টানে খ্রীস্টানে দু' দুটো প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ হয়ে গেল এ যুগেই। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলি ভেঙে খণ্ড বিখণ্ড হলো কেন?

ধর্ম তো তাদের মোটেও ঐক্যবদ্ধ করতে পারে নি, আজ চরম দুর্দিনেও পারছে না। তাদের তো শুধু ধর্ম নয়, ভাষা আর সংস্কৃতিও এক। বিশ্ব জাতিপুঞ্জের সদস্যভুক্ত হওয়ার সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান রাষ্ট্র ভোট দেয় নি, ভোট দিয়েছিল শুধুমাত্র আফগানিস্তান যাকে অনায়াসে মুসলমান রাষ্ট্র বলা যায়। কাজেই একমাত্র ধর্মের সাহায্যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সম্ভব, এ ধোপে টেকে না। ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্রই-যে সর্বোত্তম বা সবচেয়ে উন্নত, ইতিহাসে তারও কোন নজির নেই। বরং বিপরীত নজির দেদার। পাকিস্তানের সমস্যা ধর্মের সমস্যা নয়—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষমতায় সমতা-বিধান ও নিশ্চয়তা সৃষ্টিই আমাদের একমাত্র সমস্যা। ধর্মের দিক দিয়ে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, যা কিছু বিরোধ রাজনীতি আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা নিয়েই। এ দুই ক্ষেত্রে সুবিচার আর সমতা প্রতিষ্ঠাই হবে আমাদের জাতীয়তার বুনিয়াদ। এ দুই শক্তি এক অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হলে আমাদের জাতীয়তার বুনিয়াদ কিছুতেই মজবুত ও দৃঢ়মূল হতে পারে না। রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষমতা আর তার সুযোগ-সুবিধা দুই অঞ্চলে সমভাবে বণ্টিত না হলে প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা অথবা বিচ্ছিন্নতা মনোভাবের অবসান কিছুতেই আশা করা যায় না। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের হাওয়াই বুলির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তা টেকসই হতে পারে না কিছুতেই, কোথাও হয়ও নি।

গোড়াতেই বলেছি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা ও তার নিরাপত্তাবিধানের জন্যই। এ দুই ক্ষেত্রে তাদের উপর যে-অবিচার চলছিল, তার থেকে মুক্তি পাওয়াই ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। এখন আমরা নিজেরাই যদি সে অবিচারের পথ বেছে নিই, এক অঞ্চলের মানুষ যদি অন্য অঞ্চলের মানুষের উপর রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক বন্ধন চাপিয়ে দিই, তাহলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্যই তো ব্যর্থ হয়ে যায়। আর তেমন অবস্থায় অসন্তোষ এবং বিরোধ দেখা না দিয়ে পারে না—যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নানা রকম বিচ্ছিন্নতার ধুয়া—বাস্তব বা কাল্পনিক। পাকিস্তানের এক অঞ্চল যদি দুর্বল ও দরিদ্র হয়ে থাকে, তাহলে তা গোটা রাষ্ট্রের ঘাড়েই এক বিরাট বোঝা হয়ে থাকবে। ধনী-দরিদ্রে, সবলে-দুর্বলে কখনো মিল হয় না, পারে না পরস্পর সহযোগিতা করতে কিংবা

হতে একাত্মও। দুই সমকক্ষের মধ্যেই শুধু বুদ্ধি-দীপ্ত সহযোগিতা আর বন্ধুত্ব সম্ভব। রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশ সমান হলে আর সমকক্ষ হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ পেলে তখনই পরিপূর্ণ জাতীয় সংহতি স্বাভাবিক আর স্বতঃস্ফূর্ত হবেই। উভয় অঞ্চল আর উভয় অঞ্চলের মানুষের প্রতি পরিপূর্ণ ন্যায় বিচারই হবে আমার মতে, পাকিস্তানী জাতীয়তার বুনিয়াদ। রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব রকম অবিচার আর অন্যায়ের অবসান ঘটলে সহজে স্বাভাবিক ও মানবিক পথেই সামাজিক আর পারিবারিক জীবনেও সৌভ্রাত্রের সম্বন্ধ গড়ে উঠবে দুই অঞ্চলের মানুষে মানুষে। বলা বাহুল্য, অন্য সব রাষ্ট্রের মতো আমাদের রাষ্ট্রেরও বুনিয়াদ হবে জাগতিক নিয়ম আর মূল্যবোধ। এক স্বর্গরাজ্য ছাড়া অন্য কোন রাজ্যই ঐশ্বরিক তথা ধর্মের নিয়মে পরিচালিত কিংবা শাসিত হয় না। হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

চাঁদ ও কবিতা

চাঁদে মানুষ অবতরণের পর সত্যই কি চাঁদের আকর্ষণ কমে গেলো ? অনেকে বলছেন, হ্যাঁ, চাঁদ নিয়ে আর কবিতা লেখা হবে না। মানুষের পায়ে-মাড়া চাঁদকে দেখে কবিরা আর পাবে না কোন রকম প্রেরণাই। কবিতার রাজ্য থেকে চাঁদ এবার চির-নির্বাসিত। রুক্ষ শুষ্ক ধুলিকণা আর নুড়িতে গড়া চাঁদ আর কখনো সুন্দরের প্রতীক হয়ে দেখা দেবে না মানুষের চোখে, মনে আর অনুভব-উপলব্ধিতে। চাঁদ নিয়ে কেউ আর করবে না বাড়াবাড়ি, আবেগে বেসামাল হয়ে কখনো আর কেউ বলে উঠবে না : 'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো !'

আমার মন কিন্তু এতে সায় দিতে নারাজ।

সেদিন সন্ধ্যার পর যথারীতি সান্ধ্যভ্রমণ সেরে স্টেডিয়ামের দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত সড়ক ধরে পূর্বমুখী পায়চারি করছিলাম, হঠাৎ সামনা-সামনি পূব আকাশে মেঘ-ভাঙা চাঁদের অপরূপ শোভা দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক। মনে হলো, দীর্ঘকাল এমন সুন্দরের সঙ্গে চোখাচোখি ঘটে নি। কবিত্বের লেশমাত্রও আমার মধ্যে নেই, সে বয়সও আমার পেরিয়ে গেছে অনেককাল। তবুও কয়েক মুহূর্ত অবাক চোখে তাকিয়ে না থেকে আমি পারলাম না সামনের দিকে পা বাড়াতে। মুগ্ধ চোখে আকাশ পানে তাকাতে তাকাতেই সেদিন শেষ হলো আমার সান্ধ্য ভ্রমণ।

মনে হলো সব মিথ্যা। মানুষের পাদস্পর্শে চাঁদ তার কিছুই হারায় নি—তার রূপ আর আকর্ষণ আগের মতই অক্ষুণ্ণ। চাঁদের পিঠে হাজারো মানুষের পা পড়লেও, সৌন্দর্য-পিয়াসী মর্ত্য-মানুষের কাছে তার আবেদন কখনো ফুরোবে না। যেমন ফুরোয় নি সমুদ্র, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বতের। মানুষের পদস্পর্শে শুধু নয় মানুষ আর প্রাণীর পরিত্যক্ত আবর্জনায় এসব তো কতভাবেই কলঙ্কিত হচ্ছে প্রতিদিন। হিমালয়ের দুর্গম শৃঙ্গও তো পারে নি অপরাজেয় মানুষের

পদস্পর্শ এড়াতে। তাই বলে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব শোভা কিংবা নদ-নদী সমুদ্রের বিশাল মহিমা নিয়ে কি আর লেখা হবে না কবিতা? না হচ্ছে না? ফুল, শিশু, নারী কোনটাই তো আমাদের অভিজ্ঞতা আর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়, আর এসব-যে সব সময় নির্জলা আনন্দের উৎস তাও বলবার উপায় নেই। তবুও এসব আজো কবিতার বিষয়বস্তু হতে বাধে না।

'নারী নরকের দ্বার'—এ আপ্ত বাক্য আজো উচ্চারিত, তা সত্ত্বেও একথা বোধ করি জোর করে বলা যায়, নারী নিয়ে বা নারী-সৌন্দর্যের প্রেরণায় যত কবিতা লেখা হয়েছে, একক অন্য কোন বিষয় নিয়ে এত কবিতা লেখা হয় নি আজ পর্যন্ত। নারী তো শুধু সুখ-শান্তি আর আনন্দ-প্রীতির আকর নয়, অনেক দুঃখ-বেদনা আর অবাঞ্ছিত ঘটনারও কারণ। সব নারী সৌন্দর্য-ললামভূতা তাও বলা যায় না, তবুও শিল্পের প্রেরণা আর উপকরণ হতে তার কখনো বাধে নি। ঝোঁকের মাথায় মধুসূদন তো এমন কথাও লিখে বসেছেন: 'যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা'। কুকুর বা কুক্কুর লেখেন নি তিনি!

যে-নারী আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গ-আসঙ্গ আর সংঘর্ষের কারণ সে যেমন শিল্পের প্রেরণা যোগায়, যে-নারী তা নয় সেও তা কম যোগায় না। এমন কি 'কলঙ্কিতা'ও শিল্পের এলাকা থেকে নির্বাসিতা নয়, চাঁদও নয় নিষ্কলঙ্ক, এ তো আবহমান কাল থেকেই শ্রুত। 'চাঁদেরও কলঙ্ক আছে'—কলঙ্কিতার সাফাই হিসেবে এ মোক্ষম যুক্তি কে না প্রয়োগ করে থাকে আজো?

তবুও চাঁদ দেখে চিরকাল মানুষ মুগ্ধ হয়েছে, লিখেছে কবিতা। এমন কি প্রেয়সীর মুখের উপমা দিয়েছে চাঁদের সঙ্গে! বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্তাদের দেহ-ব্যবচ্ছেদ করলে যা দেখা যাবে তা চাঁদের পিঠের চেয়ে মনোহর হওয়ার কথা নয়। বরং অধিকতর কুৎসিত আর বীভৎসই-যে হবে তাতে বোধ করি সন্দেহ নেই।

আসলে চাঁদ কিছুই হারায় নি, যা ছিল তাই-ই আছে। পূর্ণিমার চাঁদ আর্মস্ট্রংদের মুখের উপর তুড়ি দিয়ে আজো হাসে, আজো শিশুর অনাবিল চোখে বিস্ময় জাগায়, আজো ভাবান্তর ঘটায় নর-নারীর মনে, সমুদ্রে আজো ঘটায় জোয়ার-ভাটা। মায়েরা এখনো বলে: আয় চাঁদ, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা! মোট কথা যে-কোন সৌন্দর্য চোখের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছলেই তা শিল্প হয়ে, কবিতা হয়ে রূপ নেয়! নজরুলের মনে একদিন সমুদ্র-সৈকতে

সে ভাবেই পৌঁছেছিল চাঁদ, যার ফলে 'সিন্ধু'র মতো অনবদ্য কবিতার জন্ম! এ কবিতার অস্তিত্ব চাঁদে বা সমুদ্রে নয়, কবির মনে, কবির উপলব্ধিতেই এ কাব্য-ভ্রূণের প্রথম অঙ্কুর! ভাষা আর ছন্দে যা অবয়বিত হয়েছে অপূর্ব কল্পচিত্রে :

তারপর চাঁদ এলো—কবে, নাহি জানি
তুমি যেন উঠিলে শিহরি!
হে মৌনী কহিলে কথা—'মরি মরি
সুন্দর সুন্দর'!
'সুন্দর সুন্দর' গাহি জাগিয়া উঠিল চরাচর!
সেই সে আদিম শব্দ, সেই আদি কথা,
সেই বুঝি নির্জনের সৃজনের ব্যথা।
সেই বুঝি বুঝিলে রাজন
একা সে সুন্দর হয় হইলে দু'জন!
কোথা সে উঠিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে
সে কথা জানে না কেউ, জানিবে না, চিরকাল
নাহি জানা রবে!

—সিন্ধু

'কোথা সে উঠিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে?'—নিঃসন্দেহে কবির হৃদয়ে। অবশ্য তার প্রবেশ পথ কবির দুটি চোখ! আকাশের চাঁদ এ ভাবে চোখের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছে কবি-কল্পনায় সমুদ্র-প্রেয়সী হয়ে এক অপূর্ব মানস-চিত্র গড়ে তুলেছে। বলা বাহুল্য, কল্প-চিত্র বা ইমেজ সৃষ্টিতে নজরুলের জুড়ি নেই। অভাব-তাড়িত, দৈন্য-পীড়িত যে-কিশোর কবি চাঁদকে 'ঝলসানো রুটি' রূপে দেখেছিলো সে দেখা তার কবি-কল্পনার জন্য মিথ্যা ছিল না সেদিন—কারণ ক্ষুধার্তের আবেগ-উপলব্ধি খাদ্য-বস্তুর রূপ-কল্পনাতেই চরিতার্থতা খোঁজে। মহাত্মা গান্ধীর মতো ভক্তজন আরো এগিয়ে গিয়ে এমন উক্তিও করেছেন : খাদ্য-বস্তুরূপে ছাড়া ক্ষুধার্তের সামনে হাজির হতে স্বয়ং ঈশ্বরও ভয় পান!

সমুদ্র বিহার বা সমুদ্রে অবগাহন যেমন সমুদ্র-সম্বন্ধে কবির আবেগ কেড়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে, চাঁদের বেলায়ও তা ব্যর্থ হবে। মানুষ চাঁদে নামলেও চাঁদের আকর্ষণ নিঃশেষিত হবে না কোনদিন।

সমুদ্র-স্নানের অসীম আনন্দ নিয়েই নজরুল তাঁর 'সিন্ধু হিন্দোলে'র অধিকাংশ কবিতা-যে লিখেছেন তা কারো অজানা নয়। কিশোর বয়স থেকেই তো রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রবিহারে অভ্যস্ত তবুও সমুদ্র-সম্বন্ধে একাধিক সার্থক কবিতা লেখার প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। চাঁদ-সম্বন্ধেও সেই একই কথা। চাঁদ সহজগম্য হলেও চাঁদ-সম্বন্ধে মানুষের আবেগের মৃত্যু ঘটবে না যেমন সমুদ্র কি হিমালয়ের বেলায় ঘটে নি।

কবিতার প্রাণ বস্তুতে নয়, কবির মনেই। কবির মনোভূমিই সব কবিতার জন্মস্থান! রবীন্দ্রনাথ নারদের জবানিতে বাল্মীকিকে অতি খাঁটি কথাই শুনিয়ে দিয়েছিলেন: অযোধ্যা নয়, তোমার মনোভূমিই রামের জন্মভূমি! চাঁদ এখনো আগের মতোই মেঘের কোলে লুকোচুরি খেলে, বইয়ে দেয় আলোর ঝর্ণাধারা, কবি সেদিকে না তাকিয়ে যদি ভাবতে বসেন, বেটা আর্মস্ট্রঙের পা যে-চাঁদকে লাথি মেরেছে সে চাঁদ কিছুতেই আমার কবিতার উপজীব্য হতে পারে না! তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। তবে চাঁদের আলোয় যে-কবির মনের দরজা জানালা খুলে যায় সে-কবির মনে ভাবের কিছুটা উচ্ছ্বাস না জেগে পারে না। মনের পাখি কল্পনার আকাশে ডানা ছড়িয়ে উড়ে বেড়াতে চাইবেই চাইবে তেমন কবির।

'বিশ্বপরিচয়ে'র লেখক রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন বটে:

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্যনবীন।
দিনে দিনে উদাসি কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ।
কেন ক্লান্ত হল সে আপনার মাধুর্যকে নিয়ে।
আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব,—
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী। —পত্রপুট: উদাসীন

এ সব তত্ত্বজিজ্ঞাসা ছেড়ে চাঁদের দিকে যখন ফিরে তাকালেন কবি শ্রেফ কবি হিসেবে তখন সেই একই কলম থেকেই বের হলো :

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাব্‌না আমার পথ ভোলে,
যেন সিন্ধুপারের পাখি তারা,
যায় যায় যায় চলে।

অথবা

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে
উছলে পড়ে আলো,
ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো। ইত্যাদি

এমন কি আধুনিক জীবনানন্দ দাশও লিখে বসলেন :

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ
তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে
রয়েছে যে অগাধ ঘুম
সে আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেল-তীব্রতা তোমার নেই,
তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও—

—বনলতা সেন : অন্ধকার

আর আমাদের তরুণ কবি চাঁদকে দেখেছেন কিনা ঘোড়ার নালের মতো :

ঘোড়ার নালের মতো চাঁদ
ঝুলে আছে আকাশের বিশাল কপাটে, আমি একা
খড়ের গাদায় শুয়ে ভাবি
মুমূর্ষু পিতার কথা, যার শুকনো প্রায়-শব প্রায় অবাস্তব
বুড়োটে শরীর
কিছুকাল ধরে যেন আঠা দিয়ে আঁটা
বিছানায়।

—বিধ্বস্ত নীলিমা : জনৈক সহিসের ছেলে বলছে

সুকান্তের উপমার মতো এ উপমাও যথার্থ হয়েছে এ কারণে যে উপমাটা দেওয়া হয়েছে এক সহিসের ছেলের মুখে, ঘোড়ার নালের সঙ্গে যার পরিচয় আজন্মের।

যে ক'টি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো তা থেকে বুঝতে পারা যাবে বাস্তব চাঁদ নয়, চাঁদ কবির মনে যে-প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় তাই তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে কবিতায় প্রাণ সঞ্চার করে, গড়ে তোলে কবিতার দেহে নানা কল্প-চিত্র। একটা স্ফুলিঙ্গ যেমন মুহূর্তে একটা দাবদাহ ঘটাতে পারে, তেমনি আকাশে উদিত খণ্ড চাঁদ কিংবা ভরা চাঁদের ভুবন-প্লাবী আলো হঠাৎ কবি-চিত্তে একটা কবিতার বিদ্যুৎ-ঝলক হয়ে দিতে পারে দেখা। একটুখানি ইঙ্গিতও-যে অনেক সময় মহৎ শিল্পের প্রেরণা হয়ে থাকে তার নজির সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাসে দেদার।

চাঁদ কিসে গড়া, সোনা দিয়ে মোড়া না বালি-কঙ্করে ঘেরা শিল্পের জন্য তা মোটেও বড় কথা নয়, শিল্পীর চোখে তা কিভাবে দেখা দিচ্ছে, দেখে শিল্পী মনে কি রকম অনুভব-অনুভূতির আবেগে শিল্পী-মন হচ্ছে আলোড়িত, আন্দোলিত এ সবই মূল্যবান। প্রিয়ার চাঁদ-মুখের উপাদানের সঙ্গে আর্মষ্ট্রঙের আনা চাঁদের উপাদানের কোন মিল আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা বিজ্ঞানীর কাজ—কবির বা শিল্পীর নয়। কিছুমাত্র মিল না থাকলেও চাঁদমুখ কথাটা মিথ্যা হয়ে যায় না। কবি আর প্রেমিকদের কাছে তা বাস্তবের চেয়েও বাস্তব। কবির দেখা আর বিজ্ঞানীর দেখায় দুস্তর ব্যবধান, কবির দেখা স্রষ্টার দেখা তাই মৃত চাঁদকেও কবি প্রাণদান করেন প্রিয়ার চাঁদমুখে যেমন তেমনি কবিতায়ও। বিজ্ঞানীর সে ক্ষমতা নেই।

মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে বলে চাঁদের মুখ কিছুমাত্র কালো হয়ে যায় নি, তার রূপালী জ্যোৎস্নাও হয়ে যায় নি আবলুষ-কালো কিংবা আলকাতরা-মাখা। সৌন্দর্য দেখার চোখ আর মন না হারালে চাঁদ চিরকালই মানুষের অনুভব-অনুভূতি আর আবেগ-কল্পনার উৎস হয়ে থাকবেই।

চাঁদ ছাড়া চাঁদের কল্পনা করা যায় কিন্তু চাঁদ-ছাড়া আমাদের পৃথিবী এক অকল্পনীয় বস্তু—তখন জীবন হবে রীতিমতো দুঃসহ। চাঁদ আমাদের আরো এক কারণে মূল্যবান—আমাদের জাতীয় পতাকার প্রধান চিহ্ন চাঁদ, ঐ আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীক। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের পঙ্‌ক্তিতেও তার স্থান নির্দিষ্ট আর অবস্থান স্বীকৃত। অতএব যে-কোন অবস্থায় চাঁদ আমাদের চাই-ই। চাঁদ নিয়ে কবিতা লেখা আমরা ছাড়তে পারি না কিছুতেই।